খ. জীবনীসাহিত্য

জীবনীসাহিত্যের কথা মধ্যযুগীয় আখ্যান কাব্য প্রসঙ্গে একবার আমরা উল্লেখ করেছি, তবে প্রথমত তা ছিল পদ্যমাধ্যমে রচিত, দ্বিতীয়ত, তাদের আমরা বলেছি সন্তজীবনী, ফলে প্রকৃত জীবনীসাহিত্যের মূল্য তাদের আমরা দিতে চাইনি। মধ্যযুগে চৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্ষদদের নিয়ে এরকম জীবনীকাব্য বা চরিতসাহিত্য লেখা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কড়চাও আছে। কড়চা বলতে সাধারণত ছোট জীবনীগ্রন্থই বোঝায় যাতে জীবনের বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে সংক্ষিপ্ত জীবনীচিত্র তুলে ধরা হয়।

অবশ্য আরো কিছু কিছু উদ্দেশ্যে কড়চা লিখিত হতো। সংস্কৃত আলংকারিকদের কাব্যজিজ্ঞাসা-সংক্রান্ত গ্রন্থ দুভাগে বিভক্ত থাকতো—কারিকা ও বৃত্তি। কারিকায় সংক্ষেপে সূত্রের মতো কোনো কথা বলে বৃত্তি অংশে তা ব্যাখ্যা করা হতো। অনেকে মনে করেন, সংস্কৃত 'কারিকা' থেকেই কড়চা শব্দটি এসেছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে—'জীবন বৃত্তান্ত বা ঐতিহাসিক ঘটনাদির বিষয় যাতে রক্ষিত হয় বা ঐ সকল বিবরণ ধ্বংস হতে রক্ষা করিবার জন্য যাতে লিখিত হয়।' সংস্কৃতে শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চা বিখ্যাত। মধ্যযুগীয় জীবনীকাব্যের মধ্যে গোবিন্দদাসের কড়চা অত্যন্ত বিতর্কিত এবং সেই কারণেই উল্লেখযোগ্য।

'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' এ কালের শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ। জীবনীসাহিত্য না হলেও লুপ্ত জীবনী উদ্ধারের কাজে পূর্বে অসাধারণ নিষ্ঠা দেখিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'সাহিত্য সাধন চরিতমালা'র প্রত্যেকটি গ্রন্থ আজকের সম্পদ। এ কালে মণি বাগচীও জীবনীসাহিত্যের একজন সার্থক রূপকার।

আমাদের দেশে সার্থক জীবনীগ্রন্থ রচনার একটি প্রতিবন্ধকতা সাধারণ পাঠকের মানসিকতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ দেশ কর্তাভজার দেশ। এখানে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষ পেলেই অল্পদিনের মধ্যেই তাকে আমরা অতিমানব বা ঋষি বানিয়ে তুলি, ফলে বিবিধ ত্রুটি ও যেসব মানবিক দুর্বলতার পরিচয়ে একটি মানুষ রক্তমাংসের সজীব মানুষ হয়ে উঠতে পারেন সেই দুর্বলতা বা ত্রুটির পরিচয় জীবনীলেখক দিতে পারেন না। ও দেশের জীবনীর সঙ্গে এদেশের জীবনীগ্রন্থের পার্থক্যই সেইখানে। বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ-এর জীবনী রচনা করেছিলেন ফ্রাঙ্ক হ্যারিস। তিনি শ-এর দুর্বল স্থানগুলি ঢেকে রাখবার কোনো চেষ্টাই করেন নি। বিখ্যাত মহিলা অ্যানি বেসান্ত শ-এর প্রণয়কাঙ্ক্ষিনী-ছিলেন। সে কথা হ্যারিস সবিস্তারেই লিখেছেন, তাতে সাধারণ মানুষের চোখে শ নিষ্কলঙ্ক হয়ে যাননি। বিবাহের পরও অনেক নারী এই বিখ্যাত নাট্যকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, হ্যারিস সেই কাহিনীও অত্যন্ত উপভোগ্য ভাবে পরিবেশন করেছেন। এতে তাঁর চরিত্রের হীনায়ন ঘটানো হল বলে নাট্যকার স্বয়ং অভিযোগ করেননি, তাঁর কোনো অনুরাগীও আক্ষেপ করেননি। অথচ এই একই ব্যাপার আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি করা হলে কেন কিছু রবীন্দ্রানুরাগী যে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠবেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেতকী কুশারীর একটি গ্রন্থে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সম্বন্ধে এই ইঙ্গিতই অনেকে ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের নামে অলীক কল্পনা প্রকাশ করা গর্হিত কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভাশালী হওয়া সত্ত্বেও একজন রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর অনুভূতি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও স্পর্শকাতর ছিল। এরকম একজন তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ তাঁর সম্বন্ধে একটা নারীর দুর্বলতা ও তার পরম নিবেদনকে উপলব্ধি করবেন এটা যেমন প্রত্যাশিত, একটি নারী এমন একটি যুগোত্তর পুরুষের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ ও ভক্তি-শ্রদ্ধা অনুভব করবেন এটাও অপ্রত্যাশিত নয়। সুতরাং এ থেকে কোনো গভীর গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠতেই পারে। তাকে আমরা অশ্রদ্ধেয়ই বা কেন বলবো এবং এরকম ঘটা অসম্ভবই বা কেন মনে করবো তার কোনো সংগত ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু এই মানসিকতা এখনো এখানে অব্যাহত আছে। যতদিন তা থাকবে ততদিন সঠিক জীবনী রচনার প্রতিবন্ধকতাও থাকবে।

• আত্মজীবনী

আত্মজীবনীকেও জীবনচরিতেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কিন্তু সাধারণ জীবনী বা Biography-র সঙ্গে আত্মজীবনী বা Auto-biography-র পার্থক্য এই যে, আত্মজীবনীতে স্বয়ং লেখকই নিজের জীবনী রচনা করেন। জীবনচরিত একেবারে সঠিক হতে পারে সেটি আত্মজীবনী হলেই, কারণ লেখকের অজানা তখন আর কিছুই থাকে না। সেইজন্যই ডঃ জনসন মনে করেছিলেন জীবনীগ্রন্থ স্বকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা মনে করি এতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধার

পরিমাণই বেশি। কারণ প্রথমত, জীবনী যখন একটি সাহিত্যকর্ম তখন উল্লিখিত ব্যক্তিটি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হওয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। অথচ নিজেকে বস্তুগত ভাবে দেখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার—চরিত্রের সেই সংযম ও উদারতা অনেকের চরিত্রেই দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে আব্রাহাম কলির একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে যার বাংলা রূপান্তর এইরকম—

> 'কোন লোকের পক্ষে নিজের বিষয় লিখতে যাওয়া যেমন তৃপ্তিকর তেমনি কঠিন। নিজের কোন অকীর্তির কথা বলতে গেলে বুক যেমন বাজে, তেমনি আত্মপ্রশংসাও পাঠকদের কাছে কর্ণপীড়াদায়ক।'

এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা খুবই শক্ত। নিজের প্রশংসা করতে গেলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কুণ্ঠা হয়, কিন্তু সেটা না করলে সত্যরক্ষা করা যায় না। নিজের নিন্দা নিজে করলে করা খুবই কঠিন ব্যাপার কিন্তু নিরপেক্ষ হতে গেলে তাও করতে হবে। অবশ্য এর বিপরীত ঘটনাই ঘটা স্বাভাবিক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। নিজের প্রশংসার সময় যে-কোনো কেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে, সেটা পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন এবং বিরক্ত হবেন। নিজের যে নিন্দা লোকসমাজে প্রচলিত সে বিষয়ে কথা বলতেও হয়তো তিনি সঙ্কোচ বোধ করবেন। ফলে আত্মজীবনীতে আমরা সঠিক তথ্য পাবো না।

আত্মজীবনীর দ্বিতীয় অসুবিধা আরো গভীর। সকলেই নিজের কথা অপরের সামনে তুলে ধরতে পারেন না, সঠিক আত্মজীবনীর নিয়মও জানেন না। তিনি যে আত্মজীবনী লিখবেন তা অপরের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। এমন এমন কথা থাকতে পারে যা তাঁর নিজের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান মনে হলেও অপরের কাছে তার বিশেষ মূল্য নেই। ফলে তাঁর জীবনের অসংখ্য খুঁটিনাটি বা 'dullest details' অন্যের কাছে তুলে ধরা অর্থহীন। কতটুকু লিখবেন এবং কতোটুকু লিখবেন না, কোন্ ঘটনাকে বড় করে তুলবেন, কাকে ছোট, কোন্ ঘটনা পাঠককে কতোটা আনন্দিত করতে পারবে—এসব চিন্তা ভাবনা করেই আত্মজীবনী লেখা উচিত।

তৃতীয়ত, কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী জীবনচরিতের পক্ষে আবশ্যক হতে পারে, আত্মজীবনীর পক্ষে নয়। আত্মজীবনীতে জীবনের কোনও একটা আপাত-ক্ষুদ্র ঘটনা লেখকের কাছে অত্যন্ত বড়ো হয়ে উঠতে পারে, বাইরে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লেখক একেবারেই অনুল্লেখ্য মনে করতে পারেন। পরের ঘটনা আগে, আগের ঘটনা পরে—এইধরনের কালানুক্রম-ভঙ্গ প্রায়ই ঘটতে পারে এবং তা ঘটে বলেই আত্মজীবনী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি আত্মজীবনী। এর লেখক এই কথাটিই বলে নেবার চেষ্টা করেছেন—"স্মৃতির পট জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয়, কত কি রাখে। কত বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।'

ইংরেজি সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আত্মজীবনীর মধ্যে নাম করা যায় St. Augustine-এর Confessions, Rousseau-র Confissions, Gibbon-র Autobiography, Davies-এর Autobiography of a Super-Tramp, M.K. Gandhi-র My Experiments with Truth, Nirode C. Chaudhuri-র Autobiography of an Unknown Indian প্রভৃতি।

বাংলায় বেশ কিছু ভাল আত্মচরিত বা আত্মজীবনী আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন', রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ছাড়াও 'আত্মপরিচয়' ও 'ছেলেবেলা', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত', সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' প্রভৃতি।

● একটি আত্মজীবনীর পরিচয়

সজনীকান্ত দাস রচিত 'আত্মস্মৃতি' আসলে একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য আত্মজীবনী। একদিকে এর বৈশিষ্ট্য, সমসাময়িক অনেক সাহিত্যিক এবং সাহিত্যিক-কলহের আলোড়ক ঘটনার পরিচয়; অন্যদিকে সরস ও সুখপাঠ্য এই গ্রন্থটি গল্পের মতোই পড়ে ফেলা যায়। প্রথম প্রকাশের সময় এটি তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে অবশ্য এক খণ্ড সংস্করণও পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডে ছিল 'ঊনবিংশ তরঙ্গ' অর্থাৎ ১৯টি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ডেও তাই, তৃতীয় খণ্ডে ছিল 'একাদশ তরঙ্গ'।

নিজের বংশ পরিচয় দিয়েছেন প্রথম তরঙ্গে। কিন্তু বংশ পরিচয় নয়, নিজের জীবন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। বর্ধমানের মানুষ, মালদহে ও বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, রাজনীতিতে দীক্ষা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএসসি পড়তে এলেন এবং 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পর পড়াশুনার পাট একেবারে চুকে গেল—এই নিয়ে প্রথম তরঙ্গ শেষ হয়েছে, তার মধ্যে সুধারাণীর সঙ্গে বিবাহও অবশ্য যুক্ত আছে। এরপর একাদশ তরঙ্গ পর্যন্ত সজনীকান্ত নিজের জীবনেরই বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত ছোটবেলা থেকেই কীভাবে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের গ্রন্থ পাঠ করতে শিখলেন, গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন সেসব, ছোটবেলাতেই রাজনীতির রাহুগ্রাসে কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন, সাহিত্য সাধনা ছিল জীবনের ব্রত, বিজ্ঞান সাধনা ছিল মর্মের ধর্ম। ভালো ছাত্র ছিলেন, দু-নৌকায় পা দিয়ে অনেকদিন চলেছেন, শেষ পর্যন্ত ছাড়তেই হল বিজ্ঞান সাধনা। শুরু হল কৃচ্ছ্রসাধনা—এখানে-ওখানে প্রুফ দেখা, ছেলে পড়ানো ইত্যাদি। সেই সঙ্গে মেসে থাকা, পড়াশুনা না চালানোর অপরাধে বাড়ির অর্থসাহায্য বন্ধ। কিন্তু আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল প্রখর, ফলে উপার্জনক্ষেত্রে দুর্গতি বেড়েই চলেছিল। একটা উদাহরণ দিই। 'শাঁসালো একটি টিউশনি ছিল, ছাত্রের বাবা কর্কশ কণ্ঠে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন—'মাস্টার, ছেলে কেমন পড়ছে?' পরে জানিয়াছিলাম ভদ্রলোক আমাকে অপমান করিবার জন্য প্রশ্ন করেন নাই, উঁহার এইধারা বচন, কিন্তু আমার চট্ করিয়া রাগ হইয়া গেল। তরতর করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলাম। আর পড়াইতে গেলাম না।'

লেখক জীবনের সূচনা বেশ বিস্তারিত ভঙ্গিতে লিখেছেন দ্বাদশ তরঙ্গে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় সবে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে এসেছেন দেশে, বার করেছেন 'শনিবারের চিঠি'। [illegible] যোগানন্দ দাসের পেছন পেছন ঘুরেও লাভ হয়নি, লাভ হল অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাল্লা লড়ে। শান্তাদেবীর সম্পাদনায় 'প্রবাসী'তে দেওয়া হল কবিতা, শনিবারের চিঠিতেও তাই। মনোনীত, কিন্তু ছাপা হয় না। এদিকে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী হিসেবে চাকরি হয়ে গেল। মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে আলাপ

হয়েছিল, কাজী নজরুল ইসলামকেও দেখেছেন। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্ররচনার প্রুফ দেখে আশ্রয় পেলেন। প্রথম মুদ্রিত হল কবিতা শনিবারের চিঠিতে, 'আবাহন'—

'ওরে ভাই গাজি রে,
কোথা তুই আজিও
কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা।'

এর পরেই শারদীয় সংখ্যায় 'কামস্কাটকীয় ছন্দ'। পরিচিত হয়ে গেলেন। কিন্তু বিখ্যাত হলেন নজরুলের কবিতাকে ব্যঙ্গ করে এবং তা যে সজনীকান্তের, তা জানতে না পেরে নজরুল-মোহিতলালের ধুন্ধুমার মসীযুদ্ধ একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার হয়ে থাকল। এই মসীযুদ্ধের প্রধান ইন্ধন ছিল বেনামে লেখা সজনীকান্তের—

"আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই,
আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর-ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই। ...
আমি নাগশিশু, আমি ফণিমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি,
আমি 'বে অব বিস্কে' 'সাইক্লোন' আমি মরুসাহারার আঁধি।"

'শনিবারের চিঠি' অবলম্বন করে কতরকম কাণ্ডকারখানা যে সজনীকান্ত করেছেন তার শেষ নেই। উদাহরণ হিসেবে Applied Literature Society-র কথা বলা যায়। এর বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল এই ভাবে:

আর ভাবনা নাই

কবিতার ঝরণা আপনার দ্বারে প্রবহমান। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, সম্বর্ধনা, বিদায় ইত্যাদি সকল বিষয়ের গভীর ভাবযুক্ত কবিতা আপনার জন্য সকল সময় ফরমাসমাফিক তৈয়ার থাকিবে। দক্ষিণার হার—বিদায় ও সম্বর্ধনা কবিতা ১০, বিবাহ কবিতা ৮, শ্রাদ্ধাদি কবিতা ৪, অন্যান্য উৎসব ও পর্বাদি বিষয়ক গাথা ৫। প্রত্যেক কবিতার স্বত্বক্রয় করিবার ব্যবস্থা এবং হার স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণের জন্য নাট্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখুন। অর্ধমূল্য অগ্রিম দেয়।

ফলিত সাহিত্য কার্যালয়
১০৯, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

পাতায় পাতায় সরস ও সব্যঙ্গ উক্তি, অনেক ভুলে যাওয়া ঘটনা, সজনীকান্ত যাঁদের বিরোধিতা করে, পরে অনুতপ্ত হয়েছেন এমন অনেক ঘটনার সমাহারে, এই আত্মজীবনী এক সাহিত্যিক মূল্য লাভ করেছে। ভাষা এত স্বচ্ছ এবং আকর্ষণীয় যে এটি যে জীবনীগ্রন্থ সে কথা আমাদের মনে থাকে না। লেখক নিজের জীবন ও সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে তুল্যমূল্য করে, পরিবেশন করতে পেরেছেন বলেই গ্রন্থটি রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে বলে আমাদের মনে হয়।

গ. দিনপঞ্জী বা ডায়ারি

দিনপঞ্জী বা ডায়ারি বলতে বোঝায় একটি দিন কীভাবে অতিবাহিত হল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বিখ্যাত মানুষজনের, তিনি যে ক্ষেত্রের লোকই হোক না কেন, দিনপঞ্জী রাখা দরকার আগাম সাক্ষাৎকার বা করণীয় বিষয় তাতে লিখে রাখবার জন্য। সাধারণ মানুষও দিনপঞ্জী লিখতে পারেন, কেউ কেউ লিখেও থাকেন, কারণ অন্য কেউ হয়তো তাতে উৎসাহ বোধ করবেন না কিন্তু তিনি নিজে সেটা উপভোগ করতে পারবেন যদি তা বেশ অনেক দিন পরে পড়েন।

দিনপঞ্জী রচনা একটি ভালো অভ্যাস, কারণ এর দ্বারা আরো দুটি উপকার হতে পারে। প্রথমত, লেখালেখির কোনো প্রবণতা থাকলেও মানুষ স্বাভাবিক সঙ্কোচবশত হয়তো তা লিখে উঠতে পারেন না—ডায়ারি লেখা অভ্যাস করলে, যেহেতু অন্য কেউ তা দেখবেন না, অসঙ্কোচে লিখতে শুরু করেন এবং দিনের পর দিন অভ্যাস করে মানুষ তাঁর লেখার সঙ্কোচ কাটাতে পারেন, লিখতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারেন। দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে অনেক রকমের আবেগ থাকে, মানুষ সারাদিনে এমন অনেক কাজ করে ফেলেন, বস্তুত যা তিনি করতে চাননি। মানুষ নিজের মনের সেই সব অবরুদ্ধ আবেগ এবং মনের এই অস্বস্তির কথা ডায়ারিতে লিখে ফেলতে পারেন। তাতে তিনি মানসিকভাবে অনেকটা ভারমুক্ত হন, শান্তি পান।

সাধারণ মানুষের ডায়ারি তাঁর নিজের কাছেই মূল্যবান, তাঁর নিকট আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব তাতে উৎসাহিত বোধ করতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিক বা সাহিত্যরসিক যখন দিনপঞ্জী রচনা করেন তখন তা সাহিত্যের আস্বাদই নিয়ে আসতে পারে। বিখ্যাত মানুষের ডায়ারি কখনও কখনও প্রকাশিত হয় এবং তা আমাদের আনন্দ দেয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ রকম একটি ডায়ারি প্রকাশিত হয়েছে 'স্মৃতির রেখা' নাম দিয়ে। এ থেকে আমরা লেখকের অন্তরঙ্গ জীবনের অনেক কথা জানতে পারি, আগামী দিনে যে ধরনের সাহিত্য রচনা করবেন তার পূর্বাভাস পেতে পারি, অনেক কল্পিত চরিত্রের উৎসের কথাও জানতে পারি। সেদিক থেকে এই রকম ডায়ারি খুব মূল্যবান। কথিত আছে শিবনাথ শাস্ত্রীর ডায়ারি পরবর্তীকালে একটি জনপ্রিয় উপন্যাসের উৎস ছিল।

প্রসঙ্গত একটি ডায়ারির উল্লেখ করতে হবে যেটি মোটেই কোনো বিখ্যাত মানুষের নয়, অথচ একটি ডায়ারিই তাকে বিখ্যাত করেছে। জার্মানীর এই বাচ্চা মেয়ে আনা ফ্রাঙ্ক হিটলারের নাজি বাহিনীর নারকীয় অত্যাচারের শিকার হয়েছিল মাত্র পনেরো বছর বয়সে। নেদারল্যান্ডে আবর্জনার স্তূপে ভর্তি একটা ঘরে আনারা আত্মগোপন করে ছিল পুরো দুটি বছর। তারপর ধরা পড়া এবং মৃত্যু। এই দু-বছরে আনা যে ডায়ারি লিখেছিল তা পরে আবিষ্কার করা হয় এবং তা ছাপা হয় 'আনা ফ্রাঙ্কের ডায়ারি' নাম দিয়ে। এখন পৃথিবীর অন্যতম প্রধান জনপ্রিয় এই বই অনূদিত হয়েছে উনিশটি ভাষায়, বিক্রি হয়েছে কুড়ি লক্ষেরও বেশি বই। এই দিনপঞ্জী অবলম্বন করে ফ্রান্সেস গুডরিচ এবং অ্যালবার্ট হ্যাকেট যে নাটক লিখেছেন তা নাট্যসাহিত্যে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছে। নাটকটিও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের কাছে অভিনীত হয়েছে। শুধু লন্ডন শহরের ফেনিক্স থিয়েটারেই সেটি অভিনীত হয়েছে একাদিক্রমে ছ মাস। বিখ্যাত চিত্রনির্মাণ-সংস্থা 'টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স' আনার জীবন নিয়ে ছবি তৈরি করেছেন।

দিনপঞ্জী থেকে আত্মজীবনী রচনার বা দিনপঞ্জীর আকারেই আত্মজীবনী রচনার একটা প্রচলিত রীতি আছে। কারণ দিনপঞ্জীতে জীবনের বিভিন্ন তথ্যের উল্লেখ থাকে, তাকে একটু সাজিয়ে নিলেই আত্মজীবনীতে পরিণত করা যায়। সাজাবার প্রশ্ন ওঠে এই কারণে যে, ডায়ারি মানুষ লেখেন নিজের আনন্দের জন্যই; তা প্রকাশিত হতে পারে, এ কথা ভেবে কেউ ডায়ারি লেখেন না। এই ভাবে ডায়ারির আকারে লেখা আত্মজীবনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইংরেজি সাহিত্যে Samuel Pepy এবং John Evelyn-এর লেখা Diaries বা James Boswell-এর লেখা Journals। বাংলায় এই ধরনের আত্মজীবনী খুব বেশি নেই, যা আছে তার মধ্যে নাম করা যায় চারুচন্দ্র দত্তের 'পুরানো কথা', চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গদাধর শর্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা' প্রভৃতির। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মচরিতও খানিকটা এই ভাবেই লেখা বলা যেতে পারে। আর একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। সাহিত্যিক সন্তোষ কুমার ঘোষ ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষের দিকে কথা বলতে পারতেন না, তখন ডায়ারিতে তিনি তাঁর মনের কথা জানাতেন, দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিও লিখতেন। মৃত্যুর পর সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শেষ দিন পর্যন্ত রসিকতা করার মতো যে মনের জোর তাঁর ছিল, তা আমাদের বিস্মিত করে।

দিনপঞ্জী সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা দরকার। সাহিত্যসৃষ্টি করতে গিয়ে কেউ কেউ সচেতন ভাবে দিনপঞ্জীর আকার গ্রহণ করেছেন। দিনপঞ্জীর বৈশিষ্ট্য এই যে সেখানে ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু বর্ণিত হয় না, একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার কোনো যোগ থাকে না, একটি চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মানুষ তার সম্বন্ধে ডায়ারিতে লিখতে পারেন—ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে কৌতূহল মেটানোর কোনো দায় ডায়ারি লেখকের থাকে না, তিনি যা দেখবেন এবং যা ভাববেন তাই সেখানে লিখে যেতে পারেন।

এই ভঙ্গিটিকে সাহিত্যের আঙ্গিকে পরিণত করে কিছু প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও উপন্যাস লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটির পরিকল্পনা করেছিলেন 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' হিসাবে, কারণ পাঁচটি চরিত্র সেখানে ছিল—ক্ষিতি, স্রোতস্বিনী, দীপ্তি, সমীর ও ব্যোম এবং ছিলেন সভার অধিপতি ভূতনাথ বাবু, তাঁরা ডায়েরির আকারে নিজেদের কথা লিখবেন, এ রকমই পরিকল্পনা ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটিরও নাম প্রথমে রেখেছিলেন 'শ্রীবিলাসের ডায়েরি'। বস্তুত এটি শ্রীবিলাসের আত্মকথনেই রচিত, যদিও দিনপঞ্জীর সঠিক আকার একে দেওয়া হয়নি।

ছোটগল্প ও উপন্যাসে এই আকারটি কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এবং সঙ্কর্ষণ রায় এই ভঙ্গিতে গল্প লিখেছেন। সত্যজিৎ রায় প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে যতো বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প উপন্যাস লিখেছেন তার প্রত্যেকটির আঙ্গিক একেবারে বিশুদ্ধ দিনপঞ্জীর মতো—প্রত্যেকটি দিনের বিবরণ শুরু করার আগে ওপরে বার ও তারিখ উল্লেখ করেছেন এবং তার পরে দিয়েছেন ঘটনার বিবরণ। অবশ্য আঙ্গিকের অনুকরণই সত্যজিৎ রায় করেছেন, প্রকৃত ডায়ারির মতো কাহিনীগুলিকে তিনি অর্ধপথে সমাপ্ত করেন নি, খাপছাড়াও করে দেননি—প্রত্যেকটি গল্পে চূড়ান্ত কৌতূহল বজায় রেখেছেন। ডায়ারির আঙ্গিক সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েও যে সার্থক গল্প রচনা করা যায়, প্রফেসর শঙ্কুর গল্পগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিগণিত হতে পারে।

● একটি সাহিত্যিক দিনপঞ্জী

অবশ্যই করুণ এবং মর্মস্পর্শী, তা সত্ত্বেও সন্তোষকুমার ঘোষের শেষ দিনগুলির অনুভূতি নিয়ে যে দিনপঞ্জী 'সন্তোষকুমার ঘোষের ডায়েরি' নামে প্রকাশিত হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ। সন্তোষকুমারের মতো ধীমানের সাহিত্যিক জীবনে মৃত্যুর অনিবার্য ও দ্রুত পদসঞ্চার অনুভব করেও, ক্যানসারের মতো মারাত্মক ব্যাধির তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করেও চিঠিতে, ডায়েরিতে তাঁর বিদায়কালীন যে অনুভূতি সাজিয়ে দিয়েছেন তা থেকে মানুষটিকেও যেমন আমরা চিনে নিতে পারি, তেমনি মৃত্যুপথযাত্রী তাঁর যে বিশেষ উপলব্ধিতে উপনীত হন সেটাও বুঝতে পারি।

থ্রোট ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। কলকাতার চিকিৎসার পালা সেরে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হসপিটালে। বাঁচার তো কোনো প্রশ্ন নেই, মৃত্যুর প্রহর গোনা শুধু। সেই সময়ে যত দিনলিপি ও চিঠি তিনি লিখেছেন, সব প্রকাশিত হত 'দেশ' পত্রিকায়। পরে এই গ্রন্থে তা সংরক্ষিত হয়েছে। হসপিটাল ছিল সমুদ্রের ধারে। সেই অসীম সমুদ্র ও মানুষের সীমিত জীবনের দ্বৈতলীলা শিয়রে অপেক্ষমাণ মৃত্যুর অনিবার্য উপস্থিতি সত্ত্বেও কীভাবে প্রতিভাত হয়, সেটাই দেখবার।

রচনাকাল খুবই সংক্ষিপ্ত অবশ্য। চুরাশি সালের তিরিশে অক্টোবর আরম্ভ হয়েছে, শেষ হয়েছে এগারো নভেম্বর। এখানে চিঠি এবং দিনলিপি দুটিই আছে বটে, বস্তুত সেই দুটি জিনিসই এক—নিজেকে উন্মোচিত করা, প্রকাশ করা, সমগ্র উপলব্ধি ব্যক্ত করা। নইলে চিঠিতে দরকারি কথা জানাবার তো কিছু ছিল না—তাঁর দরকারটাই তো হারিয়ে গেছে। কতকগুলো শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে অসাধারণ খেলা করেছেন। বলেছেন একদিন প্রচুর কথা বলেছেন তো, তাই আজ মুখে তাঁর আর কোনো কথা নেই—"এতদিন 'বাক্যালংকার' ছিলুম, আজ আমার 'নির্বচন'।" প্রায় একই কথা 'স্বরলিপি' সম্বন্ধে, বলেছেন—"কণ্ঠস্বর হারিয়েছি। এখন 'স্বর' নেই। শুধু 'লিপি'। স্বরলিপি তো সমাসবদ্ধ হয়ে। তবে তো সঙ্গীত।" সুকুমার সেনকে একটা চিঠি লিখেছিলেন, নিজের পরিচয়ে লিখেছিলেন 'অধমর্ণ, সন্তোষকুমার ঘোষ।'

সামনে বিস্তীর্ণ সমুদ্র সন্তোষকুমারকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। মৃত্যু হাতছানি দিচ্ছে অবিরত, সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে তার তুলনাও এসে গিয়েছিল অনিবার্য ভাবেই এবং দুয়ে মিলে অপূর্ব এক সাহিত্যিক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল। সমুদ্রও মৌন, তিনিও মৌন, এই কথাটি এসেছে ৪.১১ তারিখের দিনলিপিতে—'অধুনা সমুদ্রটাকে আছড়াতে দেখছি। হঠাৎ টের পাই, আমাদের স্বভাব এক। ভিতরে কত কথা, তোলপাড়, মুখে শুধু বোকা বোকা দাঁত-কপাটি ফেনা, শব্দ নেই। আমি আর এই ঢেউ, দুই-ই বোবা।'

এই তোলপাড়ের মধ্যে কি মন আছে? সন্তোষকুমারের মনে পড়েছে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের সেই বিখ্যাত বাক্যটি—'শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম?' তাই তিনি লিখেছেন সমুদ্র সম্বন্ধে—'বম্বের সাগরকে যদি কুসুম ভাবি, তবে, থৈ থৈ শরীর যে আছে, নিশ্চিত। কিন্তু মন? বোধহয় নেই। থাকলে তার একটু উথলে-ওঠা কি দেখা যেত না?' তিনিও একা, সমুদ্রও একা। তিনিও একাকিত্ব চান না, সমুদ্রও তো চায় না, একথা মনে হবার

পর লিখেছেন—'সমুদ্দুর, টইটম্বুর হয়ে আছে। তবু কি এক ফুসলানিতে অজানা পাড়ে আছড়ে পড়ছে, আঁচড়ে নখে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে বেলাভূমি। টেনে নিচ্ছে নদী-দের বুকের ভিতরে। অতএব একা নয়, তারও সঙ্গী চাই।'

মৃত্যুচিন্তা এই সময়ে আচ্ছন্ন করেছিল সন্তোষকুমারকে—করবেই, জানা কথা, কিন্তু বিপর্যস্ত করেনি, হতাশ্বাস করেনি। তাঁর দিনলিপির প্রত্যেকটি প্রসঙ্গে এবং পত্রগুলিতে তার প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব গুহকে লেখা একটি চিঠিতে—এই গ্রন্থের অংশ পাই, 'দুরন্ত বেঁচেছি। আর এখন? 'সকল আলাপ গেলে থেমে/শান্ত বীণায় আসে নেমে/সন্ধ্যা যেমন দিনের শেষে বাজে গভীর স্বনে'।"

আর-একটি জায়গায় লিখেছেন: 'থাকবার মধ্যে বাকি আছে নিদ্রা। ... এখনও আসছে। কবে ইস্তফা দেবে, কে জানে! দিন তো বয়ে গেল। ওতো খুচরো নিদ্রা। বড়ো ঘুমটা তো পড়েই আছে। তাকে ঠেকায় কে? সিস্টার বলেছে, ইওর হার্ট-বিট্‌স্ আর নর্মাল টুডে। নরমাল তো নরমাল আমার বয়ে গেল। থামলে বাঁচি। সেই প্রবাদপ্রসিদ্ধ ওস্তাদি গানের মতো।'

'জীবনের উপভোগের কোটা শেষ। এবার ভোগের পালা, যা দুঃসহ দুর্ভোগের।' কিম্বা 'বাঁচাটার সঙ্গে ঘর করা বড্ড বেশি আর বাসি হয়ে গেল, পরে দেখাই যাক না বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার ব্যবহার কেমন।' অথবা 'বাঁচা নামে ব্যাপারটাকে এত চুটিয়ে উশুল করেছি যে, এখন কর্জ করা সময়েই টিকে থাকতে হচ্ছে'—এরকম বহু মন্তব্য এই গ্রন্থে আছে। রবীন্দ্র সাহিত্যে নিষ্ঠ ছিলেন, পড়েছেন বিস্তর, ব্যাখ্যাও করেছেন অনেক—তাই রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুষঙ্গ এসে পড়েছে বারবার। মোট কথা সমগ্র গ্রন্থটিই অনুভূতির আন্তরিকতায় ও ভাষাশৈলীর ঐশ্বর্যে আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও আরো অনেক প্রসঙ্গে কথা আছে। সেই রকম একটি প্রসঙ্গ দিয়েই গ্রন্থের পরিচয় শেষ করি:

> 'নগ্নতারও একটা তীব্র মৌন আদিম চুম্বন আছে নিশ্চয়। নিষ্প্রভ, নিষ্প্রলেপ, নিরলংকার। তারাও ছড়ানো সর্বত্র—পর্বতের নিবিড় তুষারে, বৈরাগীর উদার প্রান্তরে। শিল্পীর মগ্ন দৃষ্টিতে, মৌন তুলিকায়। এবং রসিকজনের আবিষ্কারের অপেক্ষায়।'

ঘ. পত্র বা লিপিসাহিত্য

পত্র এবং পত্রসাহিত্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। পত্র একেবারেই বৈষয়িক এবং প্রয়োজনভিত্তিক হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে পত্রের প্রাপকও একজন এবং পাঠকও একজন। বিশেষ প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত করাই বৈষয়িক পত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু পত্র যেখানে সাহিত্য হয়ে ওঠে সেখানে প্রয়োজন তুচ্ছ হয়ে যায়—মনের অত্যন্ত কাছাকাছি যে আছে তার কাছে এখানে লেখক তাঁর হৃদয় উন্মোচন করেন। ব্যক্তিগত তা এখনও থাকে, তবে প্রয়োজনভিত্তিক থাকে না—হয় লঘু আলাপচারিতা, অথবা গভীর অনুভূতির প্রকাশে তা সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়। সেক্ষেত্রে পত্রটি যার কাছে প্রেরিত হয়েছে শুধু তার কাছেই নয়, সাহিত্যমনস্ক অন্য যে কোনো মানুষের কাছেই পত্রটি উপভোগ্য। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'যারা ভাল চিঠি লেখে তারা মনের জানালার ধারে বসে আলাপ করে যায়—তার কোন ভাব নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে। ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস।'

একজন প্রখ্যাত ইংরেজ সমালোচক পত্রের গৌরব আরো বৃদ্ধি করতে চেয়ে বলেছেন—'Great letter-writers are suppressed novelist, frustrated essayists born before their time.'

এই ধরনের সার্থক পত্রসাহিত্যের আলোচনা করবার আগে এ বিষয়ে আরো দুটি প্রসঙ্গ আমাদের উল্লেখ করতে হবে। প্রথমত, কালের বিচারে যেদিন থেকে লিপির আবির্ভাব সেদিন থেকে পত্রেরও উদ্ভাবন। একদিকে গ্রীকপুরাণে আমরা যেমন পাই পত্রের ব্যবহারের কথা, অন্যদিকে রামায়ণ-মহাভারতেও পত্র রচনার কথা আছে। মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপাখ্যানে দময়ন্তী হংসের পায়ে বেঁধে পত্র প্রেরণ করেছিল রাজা নলকে।

ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের গদ্য সাহিত্যের উৎসেও আছে এই পত্র। রাজা ও ভূস্বামীরা যেসব পত্র লিখতেন সেইসব পত্রেই গদ্য প্রথম ব্যবহৃত হয়। গবেষকগণ বিস্তৃত পরীক্ষার পর মোটামুটিভাবে একমত হয়েছেন যে আনুমানিক ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে অহোমরাজ স্বর্গনারায়ণকে লেখা কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের লিখিত পত্রই আমাদের প্রথম বাংলা গদ্যের নমুনা দেয়। পত্রটি সম্ভাষণের পর এইভাবে শুরু হয়েছে—

'লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তর বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি।'

দ্বিতীয়ত, পত্রের আকারটি কাজে লাগিয়ে এই ছকে বেশ কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছে—ইংরেজি সাহিত্যেও হয়েছে, বাংলা সাহিত্যেও হয়েছে। বস্তুত ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসই পত্রের আঙ্গিকে রচিত। এই উপন্যাসের নাম 'পামেলা', লেখক স্যামুয়েল রিচার্ডসন। তাঁর উপন্যাসের এই ভঙ্গি খুব আকস্মিক ভাবেও কল্পিত হয়নি। পাড়ার অশিক্ষিত চাকরাণীর দল তাঁর কাছে আসতো বিভিন্ন রকমের চিঠি লিখিয়ে নিতে। এইসব প্রেমপত্র লিখতে লিখতেই এই আঙ্গিকে একটি উপন্যাস লেখার সাধ তাঁর জাগে।

বাংলা সাহিত্যে এই আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস এমন কি কাব্যও আছে। মধুসূদন দত্ত 'বীরাঙ্গনা কাব্য' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন যা মূলত কয়েকটি কল্পিত পত্রের সমষ্টি। ভারতীয় পুরাণের কিছু নারী তাঁদের প্রেমিকের বা স্বামীর উদ্দেশে কল্পিত পত্ররচনা করছেন, এই ছিল কাব্যের বিষয়বস্তু।

বাংলা উপন্যাসে এই আঙ্গিক প্রথম ব্যবহার করেন সম্ভবত নাটোরনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্তকুমারের পত্র' উপন্যাসে। কাজী নজরুল ইসলামও এইসময় পত্র-উপন্যাস রচনা করেছেন, নাম 'বাঁধনহারা'। এই ধরনের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্রৌঞ্চমিথুন', বনফুলের 'কষ্টিপাথর', সন্তোষকুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার/ শ্রীচরণেষু মা-কে', অথবা বুদ্ধদেব গুহর 'মহুয়ার চিঠি' প্রভৃতি।

সাহিত্যরচনা নয় বা সাহিত্যরচনার আঙ্গিকমাত্র নয়, বিশুদ্ধ পত্র হিসাবে রচিত—এরকম পত্রও প্রকৃত সাহিত্যিকের হাতে পত্রসাহিত্য হয়ে উঠতে পারে। বস্তুত তা হয়েছে। প্রকৃত সাহিত্যিক বা কবি তাঁর হিসাবের খাতাতেও প্রতিভার কিছু স্পর্শ রেখে যান। সুতরাং চিঠিপত্রে তাঁদের সূক্ষ্ম অনুভূতি, রুচিবোধ এবং মানসিকতার কিছু স্পর্শ পাওয়া যাবে, এটাই স্বাভাবিক।

সেই কারণেই পাশ্চাত্য কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ওয়ালপোল, লর্ড টেনিসন, কুপার, লুকাস, রবার্ট লিও প্রভৃতি ব্যক্তির পত্র আমাদের কাছে আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সাহিত্যিকের পত্রের আস্বাদও ভিন্নতর। যেমন বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ এলেন টেরির কাছে যে পত্রগুলি লিখেছেন তা লঘু আলাপের জন্য লেখা বলে তাঁর মনের পরিহাস-তরল মনের পরিচয়ই বহন করে সেগুলি। আবার কবি কীটস তাঁর প্রিয়তমাকে যে পত্রগুলি লেখেন সেখানে তাঁর বিষণ্ণতা এবং মনের গভীর চিন্তাই ধরা পড়েছে।

বাংলা সাহিত্যেও এইরকম বেশ কিছু পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রবাসের পত্র', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিলাতের পত্র', স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালের সাহিত্যিকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিছু পত্র উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষদের প্রেমপত্রের সংকলন 'প্রিয়তমাসু'-র উল্লেখও এখানে করা যেতে পারে।

তবে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি। তিনি সারাজীবন বিভিন্ন ব্যাপারে অসংখ্য পত্র রচনা করেছেন। তাঁর পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই ধরনের গ্রন্থের সংখ্যাই অনেক, যথা—'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'ছিন্নপত্র', 'জাপানযাত্রী', 'যাত্রী', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পথে' ও 'পথের প্রান্তে'।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের মধ্যে সব রকম আস্বাদই আমরা পাই, কখনো তা লঘু ভাষায় মনের হালকা চিন্তার প্রকাশ। এর মধ্যে উচ্চস্তরের পরিহাস রসিকতাও আমরা পাই। কখনো কোনো পত্রে তিনি দার্শনিক চিন্তা বা কোনো বিশেষ সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাঁর চিঠিপত্রের স্পষ্টই দুটি বিভাগ আছে—এক ধরনের চিঠি তিনি কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, যেমন 'ছিন্নপত্র' বা 'ছিন্ন পত্রাবলী'। অন্য ধরনের চিঠি প্রকাশের জন্যই কিছু অনির্দেশ্য পাঠকের জন্য লেখা। এগুলিতে হয়তো প্রকাশের কথা চিন্তা করেই লিখেছেন, যেমন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' বা 'জাপান যাত্রী'। তাঁর সব রকমের পত্রেই যথেষ্ট সাহিত্যগুণ দেখা যায়।

● একটি পত্রসাহিত্য: ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। চিঠিগুলি প্রায় সবই লেখা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে, ১৮৮৭ সাল থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে। শুধু এর প্রথম আটখানি চিঠি লেখা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে। চিঠিগুলি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী স্বহস্তে নকল করে না দিলে এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হত না। সুতরাং বোঝা যায় গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশে চিঠিগুলি লেখা হয় নি। অর্থাৎ এগুলি বিশুদ্ধ পত্র, এবং আমাদের মতে সাহিত্য, তাই এগুলিকে নিঃসংশয়ে বলা চলে পত্রসাহিত্য।

পত্র কেমন করে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় সে বিষয় খুব সাধারণ সিদ্ধান্ত তো নিশ্চয়ই এই যে, লেখকের দক্ষতা এবং অনুভবের গভীরতাই তার প্রধান কারণ, কিন্তু 'ছিন্নপত্রে'-র একটি চিঠিতেই আরো একটা কারণ পাওয়া যায়। 'গানভঙ্গ' কবিতায় যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'একাকী গায়কের নহে তো গান', এখানেও ইন্দিরাকে বলেছেন—'আমি তো

আরো অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি।' অর্থাৎ পত্র যার কাছে লেখা হচ্ছে, তারও একটা ভূমিকা এখানে আছে। এটা সাহিত্য হয়ে উঠেছে, সে স্বীকৃতিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। তিনি ইন্দিরা দেবীকে অনুরোধ করেছিলেন চিঠিগুলি একবার দিতে, তিনি টুকে নেবেন, কারণ—'এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে—তখন আজকেকার এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্ত-জ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকা ভাবে ফিরে পাব—আমার, গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।'

প্রথম জমিদারির দায়িত্ব দিয়ে শিলাইদহে পাঠানো হয় যখন রবীন্দ্রনাথকে, দিনরাতের বেশির ভাগ সময় কেটে যেত বোটে তখনকার অভিজ্ঞতা-প্রকাশক চিঠিগুলির সংকলনই 'ছিন্নপত্র'। ভৃত্যরাজতন্ত্রে আবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাইরে এলেন এবং মুক্তবিশ্বের স্বাদ পেলেন, এজন্য তো বটেই, জীবনকে প্রথম ভালো ভাবে উপভোগের সুযোগ পেলেন, সেই জন্যও সম্ভবত এই উপলব্ধিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান।

লেখার ভাষা এবং অনুভূতির গভীরতা ও আন্তরিকতায় প্রত্যেকটি চিঠিই আস্বাদ্য এবং উপভোগ্য। চিঠিগুলি পড়েই বোঝা যায়, ব্যক্তিগত সূত্র এবং উপলক্ষ হলেও কবির অনুভূতি নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই বেরিয়ে আসছে এবং ব্যক্তিগত মানুষই যে তা উপভোগ করতে পারবেন এমন নয়, সমস্ত সাহিত্যসাধক মানুষের কাছেই তা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বিষয়ের বৈচিত্র্যও অনেক বেশি। নতুন পরিচয়ের মধ্যে আছে পল্লিপ্রকৃতি, নদী, ঝড়জল, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদী ও বালুচর, পল্লির সহজ-সরল মানুষ—অনেক কিছু। ১৮ সংখ্যক চিঠিতে লিখেছেন, 'পাড়াগেঁয়ে মধ্যাহ্নের এই হাঁসের ডাক, কাপড় কাচার শব্দ, নৌকো চলা জলের ছল্ ছল্ ধ্বনি, দূরে গোরুর পাল পার করবার হৈ হৈ রব এবং আপন মনের ভিতরকার একটা উদাস আলস্যপূর্ণ স্বগত সংগীতস্বর।'

নদী সম্বন্ধে মুগ্ধতা কবির অনেক পত্রেই আছে। ১৯-সংখ্যক পত্রে দেখি—'খুব' উঁচু পাড়—বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয়—এমন শান্তিময় এমন সুন্দর, এমন নিভৃত—দুই ধারে সেই সৌন্দর্য বিতরণ করে নদীটি এঁকে বেঁকে চলে গেছে—আমাদের বাংলা দেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই।'

নদীর চরের বিচিত্র রূপ ও বিচিত্র বর্ণনা বেশ কয়েকটি পত্রেই আছে। একটির উল্লেখ করি। ১০-সংখ্যক চিঠিতে তিনি লিখেছেন—'প্রকাণ্ড চর—ধু ধু করছে—কোথাও শেষ দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়—আবার অনেক সময় বালিকে নদী বলে ভ্রম হয়—গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই'—বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরা ভিজে কালো মাটি জায়গায় জায়গায় শুকনো সাদা বালি।'

নদীর ওপর থাকলে ঝড়জলের অভিজ্ঞতা হয় সম্পূর্ণ অন্যরকম। সে অভিজ্ঞতার কথা কয়েকটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন। শিলাইদহে থেকে লেখা ৮৭-সংখ্যক চিঠির ছোট্ট একটি অংশ উদ্ধার করি: 'কাল সমস্ত রাত তীব্র বাতাস পথের কুকুরের মতো হু-হু করে কেঁদেছিল—আর বৃষ্টিও অবিশ্রাম চলছে। মাঠের জল ছোটো ছোটো নির্ঝরের মতো নানা দিক থেকে কল্ কল্ করে নদীতে এসে পড়ছে।'

প্রকৃতির রূপের যে ছবি ছিন্নপত্রে আছে, পল্লিগ্রামের মানুষের যে নিবিড় পরিচয়ের ছবি তিনি এঁকেছেন, তাও প্রায় প্রতি পত্রেই ফুটে উঠেছে—উদাহরণ দিয়ে তা শেষ করা যাবে না। কিন্তু এছাড়াও কবির মানসচেতনায় যে ছবি এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে তাতে এর সাহিত্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রবল ভাবে। শুধু প্রকৃতিকে কবি দেখেন নি, এই প্রকৃতির সঙ্গে কবির যে জন্মযুগের সম্পর্ক আছে, প্রকৃতির সৃজন মুহূর্ত থেকে তিনি যে তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন—এ কথা তিনি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় বলেছেন, এখানেও প্রায় সেরকমই আছে। 'বসুন্ধরা' কবিতায় যে কথা বলেছেন ঠিক সেই কথা পাই ৬৪-সংখ্যক পত্রে—'এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত।'

আসলে পত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। এই সব পত্রে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে কবিতার খসড়া আছে, গল্পের স্কেচ আছে, এমনকী নাটকের পরিকল্পনাও রয়েছে। কাজেই বিস্তৃত আলোচনা না করেও বলা যায়, 'ছিন্নপত্র' পত্র হয়েও অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে পেরেছে গদ্যসাহিত্যে।

৬. ভ্রমণ সাহিত্য

অচেনাকে জানবার আগ্রহ মানুষের চিরদিনের। নিজে যেটুকু অঞ্চলকে প্রয়োজনের তাগিদে চিনি, তার বাইরে জনপদগুলির চেহারা কেমন, সেখানকার মানুষের জীবন-যাত্রা কীরকম, সেই দেশগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিছু আছে কিনা—এসব মানুষ দীর্ঘকাল থেকে জানতে চেয়েছে এবং আজও চায়। এই কারণেই মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েনের মতো পরিব্রাজক পুরাকালে ভ্রমণের নেশায় পৃথিবী-পরিভ্রমণ করেছিলেন, এ যুগের রামনাথ বিশ্বাসের মতো মানুষও বিশ্বপথিকে বার হয়েছিলেন। মানুষের মনে এই নেশা আছে বলেই আজো স্বল্প বা দীর্ঘ ছুটিতে মানুষ বেরিয়ে পড়ে অচেনা অথবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসমৃদ্ধ জায়গায় বেড়াবার জন্য। মানুষের মনের এই চিরন্তন পিপাসাই ব্যক্ত হয়েছে কবিগুরুর কণ্ঠে—

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব কতনা অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।'

ভ্রমণের নেশা মানুষের আছে বলেই অজানার সঙ্গে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রাখবার প্রচেষ্টাও মানুষ অনেক দিন থেকেই করে আসছে। অবশ্য বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক বিবরণ, বিভিন্ন মানুষের জীবনযাত্রার তথ্যসমৃদ্ধ পরিচিতিই যদি এইসব রচনার একমাত্র উপকরণ হতো তাহলে ভূগোল এবং সমাজবিজ্ঞানের গ্রন্থের মতোই তাদের আকর্ষণ হতো কেবল তথ্যের

কারণেই। কিন্তু এইসব ভ্রমণ-কাহিনী যে সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে তার কারণ সেখানে কেবল অজানা তথ্যই নেই, আছে মানুষের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার অনুভূতি। সেই কারণেই বস্তুগত বিবরণকে অতিক্রম করে মানুষের অনুভূতির রঞ্জক তাদের বিচিত্রভাবে উপভোগ্য করে তুলেছে।

এই প্রসঙ্গে ভ্রমণবৃত্তান্ত কেমন করে সাহিত্য হয়ে ওঠে, শুধু অভিজ্ঞতা থাকলেই যে হয় না, এ বিষয়ে দু-একজন সাহিত্যিকের অভিমত স্মরণ করতে পারি। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'ঘটনার নামই অভিজ্ঞতা নয়, ঘটনা হচ্ছে কাঁচা মাল যা থেকে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। এবং সেই সৃষ্টি মনের বিশেষ এক রকম রসায়ন-ক্রিয়া—বিশেষ একটি ক্ষমতাসাপেক্ষ।' অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, 'বেরোবার আগে আমি বিস্তর পড়াশোনা করি, ফিরে আসার পরেও আরো পড়ি। তারপর লিখতে বসি ভ্রমণকাহিনী।'

অবশ্য এইসঙ্গে যদি ভাষার ঐশ্বর্য যুক্ত হয় তবে ভ্রমণকাহিনী আরো আস্বাদ্য এবং রমণীয় হয়ে ওঠে। সেইজন্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের হাতে ভ্রমণকাহিনী প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যে পরিণত হয়। যেমন এ কালের বিশিষ্ট ভ্রমণসাহিত্য রচয়িতা যাযাবর যে দুটি ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছিলেন—'দৃষ্টিপাত' এবং 'ঝিলম নদীর তীরে', কেবল অনবদ্য ভাষার কারণেই সেগুলি বার বার পড়া যায়। এর একটু উদাহরণ—'বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ ; তাতে আছে গতির আবেশ, নেই যতির আয়েস।'

ভ্রমণকাহিনীর সূত্রপাত কবে থেকে, বলা খুবই শক্ত, তবে স্থানের বর্ণনা বা যাত্রাপথের বর্ণনা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগেই পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতমূলক কাব্যে গৌরাঙ্গদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কথা আছে। গোবিন্দদাসের কড়চায় লেখা হয়েছে—

'তারপরে ঘর হইতে হইয়া বাহির।
গঙ্গা পার হয়ে তবে চলে ধর্মবীর।
পার হৈয়া প্রভু চলে কটক নগরে।
পেছনে পেছনে যাই সেবা করিবারে।।'

পদাবলীর বিখ্যাত কবি নরহরি চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' ও 'ব্রজ পরিক্রমা'। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের তৃতীয় অংশের বর্ণনীয় বিষয় ছিল প্রতাপাদিত্যকে দমনের জন্য মানসিংহের যশোহর আগমন ও বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করে ভবানন্দসহ দিল্লীযাত্রা। এখানেও ভ্রমণ পথের কিছু বর্ণনা আমরা পাই।

তবে এগুলিকে আমরা ভ্রমণকাহিনীর পূর্বাভাসই বলবো ভ্রমণকাহিনী নয়। কারণ ভৌগোলিক জ্ঞান যে মধ্যযুগীয় কবিদের খুব ভালো ছিল না, কথাটা প্রত্যাশিত নয়, তার প্রমাণ কবি মুকুন্দর 'গুজরাট নগরপত্তন'। এই গুজরাট নগরের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে কেউ যদি ভৌগোলিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেন, তিনি যে কিছুটা আশাহত হবেন, নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভ্রমণকাহিনীর সূচনা আমরা ধরতে পারি জয়নারায়ণ ঘোষালের 'কাশী-পরিক্রমা' গ্রন্থটিকে। অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে রচিত। কাশীর মন্দির, তৎকালীন জীবনযাত্রা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি অনেক কিছুই সেখানে ভ্রমণ করতে গিয়ে জয়নারায়ণ ঘোষাল লক্ষ করেছিলেন এবং গ্রন্থে তার নিপুণ পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য এরকম : 'তাৎকালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা একশত বৎসরের যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্তিটি আমাদের চক্ষে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে।'

একেবারে প্রথমদিকে রচিত তিনটি ভ্রমণকাহিনীর কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। এগুলি হল যদুনাথ সর্বাধিকারীর 'তীর্থ-ভ্রমণ', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যক্তিক স্পর্শযুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্তের ইওরোপ ভ্রমণসংক্রান্ত ডায়েরির অনুবাদ। যদুনাথ সর্বাধিকারীর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে, কিন্তু এটি রচিত আরো প্রায় চল্লিশ বছর আগে। মাত্র চল্লিশ টাকা সম্বল করে কীভাবে তিনি তীর্থযাত্রা করেছিলেন চার বছর ধরে কোথায় কোথায় ভ্রমণ করেছেন, তার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর রোজনামচায়। গ্রন্থটিতে শুধু যে বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা আছে তাই নয়, সেখানকার মানুষ ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কীর্তিরও পরিচয় আছে। যেমন গয়ার ভিক্ষুকদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'ভিক্ষুক সকলেই। যাহার দশ হাজার টাকার অলঙ্কার আছে, এক কড়া কড়ির জন্য সেও লালায়িত। তাহাদিগকে যদি কেহ ক'হে, তোমরা এমত ভিক্ষা জন্য কি জন্য ক্লেশ কর। তাহারা উত্তর করে যে, আমাদের যাহা ধনসম্পত্তি, এই মত ভিক্ষাভিন্ন অন্য উপায়ে তাহা হয় নাই।'

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যদুনাথ পরিভ্রমণ করেছেন, লিখেছেন আজমীর শরীফ ও খাজাবাবার কথা, হরিদ্বারে কুম্ভ মেলার কথা, 'পুরনো দিল্লীর 'ভুলভুলড়ি মসজিদের' কথা। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থটি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতা থেকে নদীপথে ভ্রমণে বার হলে 'ভ্রমণকারিবন্ধু হইতে প্রাপ্ত' শিরোনামে এই রচনাগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। মূলত পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ অধুনা যাকে আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বলি, সেখানকার বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণই এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। গদ্য রচনাতেও ঈশ্বরচন্দ্রের মানসিকতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। একটু গদ্যাংশ উদ্ধার করলেই সে কথা বোঝা যাবে—'সে বিষও নাই। সে চক্রও নাই, অথচ ফোঁস-ফোঁসানির ত্রুটি হয় নাই, ইঁহারা অভিমানের অধীন হইয়া অনেক সম্পত্তি ও সুখসৌভাগ্যের হানি করিয়াছেন, অহঙ্কার পরবশ না হইলে এত বিপদগ্রস্ত কখনই হইতেন না, কেবল অহঙ্কারেই সর্বনাশ করিয়াছেন।'

রমেশচন্দ্র দত্ত জলপথে ইউরোপ গমন করেন এবং তিন বছরেরও বেশি সময় সেখানে অতিবাহিত করেন, সুতরাং তাঁর ভ্রমণকাহিনী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ডায়ারিতে ইংরেজিতে লিখিত এই ভ্রমণকাহিনী সম্ভবত অন্য কেউ বাংলায় অনুবাদ করেন।

একেবারে প্রথম দিকে রচিত ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে আরো দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিমালয় বর্ণনামূলক গ্রন্থ এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ দর্শন'। দেবেন্দ্রনাথের রচনায় তথ্য আছে, তাঁর বিশিষ্ট অধ্যাত্ম অনুভূতির স্পর্শও আছে, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা আরো প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক। তাঁর ভ্রমণকাহিনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—'সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিষ কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।'

একটু ভিন্নভাবে পরিবেশিত সেকালের একটি ভ্রমণকাহিনী দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন।' উদ্দেশ্য ভ্রমণকাহিনী লেখা কিন্তু সেটি লিখবার জন্য তিনি একটি কল্পকাহিনীর উদ্ভাবন করেছেন। পরবর্তীকালে 'পয়সার ডায়েরি' নামে একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, লেখক সম্ভবত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সেখানে একটি পয়সা তার আত্মজীবনী রচনা করছে। এই

ভঙ্গিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দেওয়া আছে। এই গ্রন্থে আমরা ভারতবর্ষের বাইরের অন্যান্য দেশের বর্ণনাও পাই।

কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের হাতে ভ্রমণকাহিনী একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাঁকে বিভিন্ন কারণে পরিভ্রমণ করতে হয়েছিল এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁর অজানাকে জানার আনন্দ ও বিচিত্র অনুভূতি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি লেখা হয়েছে পত্রের ভঙ্গিতে। তাঁর এইসব ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে 'যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাভা-যাত্রীর পত্র', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে কিছুটা গল্পকাহিনী সংযোগ করলে তা আরো উপভোগ্য হয়ে ওঠে বলে আধুনিক কালের ভ্রমণসাহিত্যে এই প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায়। প্রবোধকুমার সান্যাল দুটি অসাধারণ ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছেন—'মহাপ্রস্থানের পথে' এবং 'দেবতাত্মা হিমালয়।' এর মধ্যে প্রথম গ্রন্থটিতে একটি উপভোগ্য কাহিনী আমরা লাভ করি।

এইরকমই একটি অসামান্য ভ্রমণকাহিনী 'দেশে বিদেশে' লেখক সৈয়দ মুজতবা আলি। গ্রন্থটিতে কাবুল ভ্রমণের যে অন্তরঙ্গ চিত্র আছে তাতে সেখানকার মানুষের একটি প্রাণবন্ত চিত্র আমরা লাভ করি। এখানেও সুন্দর একটি কাহিনী লেখক আমাদের শুনিয়েছেন। গ্রন্থটির উপভোগ্যতার একটি বড় কারণ লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা। ভ্রমণকাহিনী রচনার সমস্ত প্রথা একেবারে নস্যাৎ করে তিনি গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এইভাবে—'চাঁদনি থেকে ন-সিকে দিয়ে একটা শার্ট কিনে নিয়েছিলুম।'

ভ্রমণসাহিত্যে বাংলা ভাষা রীতিমত সমৃদ্ধ বলা চলে। কাহিনী প্রায় বর্জন করে রমণীয় ভাষায় ভ্রমণ বৃত্তান্ত ফুটিয়ে তুলেছেন অনেকে। উল্লেখ করা যায় জলধর সেনের 'হিমালয়', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে', দেবেশ দাসের 'ইয়োরোপা', রামনাথ বিশ্বাসের 'লালচীন', মনোজ বসুর 'চীন দেখে এলাম' প্রভৃতি গ্রন্থের। কেবল দর্শনীয় স্থান পরিভ্রমণ করেছেন এবং আন্তরিক ভাবে তা একের পর এক গ্রন্থে বর্ণনা করে গিয়েছেন এমন লেখকও আছেন, যেমন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আবার ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে গল্পের ভাগ একটু বেশি যোগ করেছেন এমন লেখকও আছেন, যেমন শঙ্কু মহারাজের 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' গ্রন্থটি পাঠ করে গল্পের স্বাদও কিছু পাওয়া যাবে। অবধূতের লেখা 'মরুতীর্থ হিংলাজ' গ্রন্থে অবশ্য ঘটনার নাটকীয়তা অনেক বেশি। পর্বত-অভিযান নিয়ে যেসব গ্রন্থ বাংলায় লেখা হয়েছে, উত্তেজনার খোরাক সেখানেও আমরা অনেক পাই, যথা গৌরকিশোর ঘোষের 'নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি' বা বীরেন্দ্রনাথ সরকারের 'রহস্যময় রূপকুণ্ড'। ভ্রমণকাহিনী ঐতিহাসিক গবেষণার আকর-গ্রন্থ হয়ে রয়েছে, এমন উদাহরণও আছে, যেমন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ'।

বেশ কিছু খণ্ডে রচিত 'রম্যাণি বীক্ষ্য' গ্রন্থের উল্লেখ না করে এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত হতে পারে না। এই গ্রন্থের লেখক সুবোধ চক্রবর্তী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল পর্বে পর্বে পৃথক খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের মতো এখানে ভ্রমণের সঙ্গেই কিছু কল্পিত কাহিনী এবং সেই কাহিনীর কল্পিত চরিত্রও আছে। এই কারণেই কোনো কোনো সমালোচক এদের খাঁটি ভ্রমণকাহিনী না বলে ভ্রমন্যাস (ভ্রমণ + উপন্যাস) হিসাবে অভিহিত করতে চান। অবশ্যই এই নামকরণ কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক। আমরা মনে করি, ভ্রমণ কাহিনীকে আস্বাদ্য এবং উপভোগ্য করে

তুলবার জন্য একটা কাহিনীসূত্র তাতে থাকতেই পারে, কিন্তু ভ্রমণকাহিনীর চরিত্র যেন তাতে নষ্ট না হয় সে বিষয়েও তাকে সতর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ লেখকের সংযম এবং মাত্রাবোধই ভ্রমণকাহিনীকে সজীব করে রাখতে পারে।

● একটি ভ্রমণকাহিনীর পরিচয়

গল্প-উপন্যাস নয়, একটি ভ্রমণকাহিনী রচনা করেই পাঠকদের হৃদয় জয় করেছেন, এমন কয়েকটি গ্রন্থের নাম যদি করতে হয়, সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' যে তাদের অন্যতম হবেই, নিঃসন্দেহে সে কথা বলা যায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই একই কথা বলেছিলেন—'বাঙলা ভাষায় দেশভ্রমণকে অবলম্বন করে ... অন্যতম রসসৃষ্টি।'

সাধারণভাবে দেখতে গেলে এটি লেখকের কাবুল যাত্রা ও অল্প দিন সেখানে বসবাসেরই স্মৃতি-রোমন্থন। কাবুল তো বিদেশ, সুতরাং গ্রন্থের নাম 'দেশে বিদেশে' কেন, এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এ বিষয়ে লেখকের উত্তর, "দেশে বিদেশে" শব্দার্থে লিখেছি অর্থাৎ বইয়েতে কিছুটা 'দেশের' বর্ণনা পাবে যথা পেশাওয়ার ইত্যাদি, আর বাকিটা 'বিদেশের' অর্থাৎ এ স্থলে কাবুলের।' ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এ গ্রন্থ রচিত, কাজেই পেশাওয়ার তখন অবিভক্ত ভারতবর্ষেরই অন্যতম অঙ্গ ছিল।

মূলত তিনটি পর্যায় আছে এই যাত্রার। সূচনায় দেখি, হাওড়া স্টেশন থেকে কাবুলের উদ্দেশে যাত্রা ও শেষ পর্যন্ত কাবুলে পৌঁছানো; দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখকের কাবুলের প্রবাস-জীবনের বর্ণনা এবং তৃতীয় পর্বে আমীর আমানুল্লার সংস্কার-প্রচেষ্টার হাঙ্গামার বাড়াবাড়িতে কাবুলে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি এবং তারই ফলস্বরূপ লেখকের কাবুল ত্যাগ। কাবুলের রাজনৈতিক অবস্থা, ক্ষমতা হস্তান্তরের বিশদ বর্ণনা বা ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েমের ইতিহাস বা একটি পুতুল শাসক বসিয়ে রুশ আগ্রাসন ঠেকিয়ে রাখবার প্রচেষ্টার বিবরণ এখানে নেই—রাজনৈতিক অবস্থার কথা যেটুকু এসেছে তা শেষ পর্বে আমানুল্লার সংস্কার-প্রয়াস প্রসঙ্গেই। কিন্তু সম্ভবত সেই জন্যই গ্রন্থটি কাবুলের ক্ষমতা-উত্থানপতনের দলিল না হয়ে একটি অসাধারণ ভ্রমণ-আলেখ্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

গ্রন্থের আরম্ভটিই অসাধারণ। কাবুল আমাদের অপরিচিত দেশ, সেখানকার রীতিনীতি, আদব-কায়দাও আমরা কিছু জানি না বললেই হয়। অন্য দিকে এর লেখক শান্তিনিকেতনের ছাত্র, বহুভাষাবিদ্ এক পণ্ডিতের জন্য খ্যাতিমান। কাজেই একটি গুরুগম্ভীর ভূমিকা দিয়ে গ্রন্থ শুরু হবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। অথচ শুরুটা হয়েছে এইভাবে: 'চাঁদনি থেকে ন-সিকে দিয়ে একটা শার্ট কিনে নিয়েছিলুম।' অতঃপর ট্রেনে সহযাত্রী এক ফিরিঙ্গি তার বিলাসে-প্রলম্ব নিজহাতে প্রস্তুত ডিনার যখন বার করে তখন দেখা যায় লেখকের জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট থেকে কেনা ডিনার-প্যাকেটের সঙ্গে তার এতটুকু তফাত নেই।

এইরকম হালকা চালেই এগিয়েছে ভ্রমণকাহিনী। পেশোয়ার যাওয়ার পথে শিখ এবং পাঠানের বিলক্ষণ আধিক্য দেখে লেখকের মনে বিবিধ চিন্তা জাগে, এগুলিকে আর যাই বলা যাক, গুরুতর গবেষণার বিষয় বলা যাবে না, কারণ এর মধ্যে একটি ছিল 'তুলনামূলক

লাড়িতত্ত্ব'। পাঠানদের আড্ডা এবং মজলিসের যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তাতে এদের সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক পরিচয়ের যাবতীয় তথ্য দিতে বললেও বোধহয় এদের এত ভালো পরিচয় আমরা লাভ করতাম না। বাঙালিদের সঙ্গে গল্পবাজ পাঠানদের যে এত মিল, সেটা জানতে পেরে আমরা কৌতুক বোধ করি। পেশোয়ারে গিয়ে পাঠানদের দিলদরাজ আতিথ্যের যে পরিচয় পেয়েছেন সেটাও উল্লেখ করবার মত। এমনিতে অত্যন্ত শান্ত এবং সজ্জন। কিন্তু 'বেইমান বললে পাঠানের রক্ত খাইবার পাসের টেম্পারেচার ছাড়িয়ে যায়, আর তাইকে বাঁচাবার জন্য সে অত্যন্ত শান্তমনে যোগাসনে বসে আঙুল গোনে, নিদেনপক্ষে তাকে কটা খুন করতে হবে।'

পেশোয়ার থেকে মোটরবাসে জালালাবাদ হয়ে কাবুল। যাত্রাপথ এবং সহযাত্রীদের বর্ণনায় এই অংশটি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে আছে। রাস্তার প্রাণঘাতী বাঁক আছে, লেখক জানাচ্ছেন—"সে সব মোড় নেবার সময় আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করেছিলাম এবং সেই খবরটি সর্দারজীকে দেওয়াতে তিনি যা বললেন, তাতে আমার সব ভয় ভয় কেটে গেল। তিনি বললেন, 'আমো চোখ বন্ধ করি'।"

বাজার, সরাইখানা আর আড্ডা হচ্ছে কাবুলের সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু। কাবুলের সামাজিক জীবন মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) খাস কাবুলী, (খ) ভারতীয় অর্থাৎ পঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান ও খেলাফৎ সমর্থক ভারতত্যাগী-মুহাজির এবং (গ) বিভিন্ন রাজদূতাবাসের কর্মচারী।

কাবুল প্রবাসের বহু চিত্তাকর্ষক ঘটনা গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ আছে, অনেক টুকরো শায়েরি এবং কবিতার প্রয়োগে কাহিনী সমৃদ্ধ হয়েছে, বহু বিচিত্র চরিত্র সেখানে স্থান পেয়েছে, কিন্তু কাবুলে লেখকের একনিষ্ঠ সেবক আবদুর রহমানের চরিত্র পাঠকদের মনে যে গভীর রেখায় দাগ কেটে যায় তা গ্রন্থপাঠের দীর্ঘদিন পরেও মুছে ফেলা যায় না। অথচ তার চেহারার বর্ণনা শুনলে তাকে ভয়ংকরই মনে হতে পারে—"ছ ফুট চার ইঞ্চি। ... লম্বাই মিলিয়ে চওড়াই। দুখানা হাত হাঁটু পর্যন্ত নেবে এসে আঙুলগুলো দু কাঁদি মর্তমান কলা হয়ে ঝুলছে। পা দুখানা ডিঙি নৌকার সাইজ। ... এ কান ও কান জোড়া মুখ—হাঁ করলে চওড়া-চওড়ি কলা গিলতে পারে। এবড়ো খেবড়ো নাক, কপাল নেই।"

তার আপ্যায়নের ঘটাও একটু শোনানো দরকার, 'ছোটখাটো একটা গামলা ভর্তি মাংসের কোরমা বা পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন কাথে সেরখানেক দুম্বার মাংস—তার মাঝে মাঝে কিছু কিছু বাদাম কিসমিস লুকোচুরি খেলছে, এক কোণে একটি আলু অপাংক্তেয় হওয়ার দুঃখে ডুবে মরার চেষ্টা করছে। আরেক প্লেটে গোটা আষ্টেক ফুল বোম্বাই সাইজের শামী কাবাব। বারকোশ পরিমাণ মাত্রায় এক ঝুড়ি কোফতা-পোলাও আর তার ওপর বসে আছে একটি আস্ত মুর্গী-রোস্ট।'

সেবায় যত্নে ভালবাসায় আবদুর রহমান হয়ে উঠেছিল লেখকের বান্ধব। তিনি বলেছেন 'উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে এবং সেই শেষ বিদায়কে যদি শ্মশান বলি তবে আবদুর রহমান শ্মশানেও আমাকে কাঁধ দিল। ... তাকে বান্ধব বলব না তো কাকে বান্ধব বলব?'

চলে আসতে হয়েছিল বাধ্য হয়েই। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতনের মতই যেন শেষ পর্যন্তও রহমানের বিশ্বাস হচ্ছিল না, প্রভুটি তাঁর একলাই চলে যাবে, অবুঝ বায়না করেছিল,

সকলের হাতে পায়ে ধরে প্লেনে একটু জায়গা করে নিতে পারবে। চলে আসার আগে লেখকের হাতে সে চুমো খেয়েছে। লেখক বলেছেন 'ব আমানে খুদা, আবদুর রহমান' (তোমাকে খোদার আমানতে জমা রাখলাম আবদুর রহমান), উত্তরে আবদুর মন্ত্রোচ্চারণের মত একটানা বলে গিয়েছে—'ব খুদা সপুর্দমৎ, সাহেব' (তোমাকে খোদার হাতে সমর্পণ করলাম সাহেব)।

শেষ বর্ণনাটি এইরকম: 'বহুদিন ধরে সাবান ছিল না বলে আবদুর রহমানের পাগড়ি ময়লা। কিন্তু আমার মনে হল চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি আর শুভ্রতম আবদুর রহমানের হৃদয়।'

চরিত্রটি কীরকম প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এবং শেষ বিদায় কতটা মর্মস্পর্শী হয়েছে তা খানিকটা বোঝা যাবে ১৯৪৯ সালের ২৬ জুন তারিখে রবিবারের হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড পত্রিকায় 'দেশে বিদেশে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে করা এই মন্তব্য থেকে: "Even if the rest of the book faded out of memory, the figure of Abdur Rahaman with his broad chest and even broader heart, his soiled turban and tearful eyes giving a send-off to his master would haunt the memory for ever."

কোনো সন্দেহ নেই, 'দেশে বিদেশে' একটি স্মরণীয় ভ্রমণকাহিনী এবং বাংলা সাহিত্যের সম্পদবিশেষ।

চ. রম্যরচনা

প্রবন্ধের অন্যতম বিভাগ ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সঙ্গে যার সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশ সেটি হল রম্যরচনা। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মতোই এর থাকে একটি রমণীয়তা, খেয়ালির কল্পনার অবাধ বিস্তার এবং তথ্যভারের পরিবর্তে 'রচনারস সম্ভোগের' আয়াসমানতা। তবে তফাৎ এই যে রম্যরচনাকে যে ব্যক্তিগত হতেই হবে এর কোনো মানে নেই, তা বস্তুগত কোনো অবলম্বনকে উপলক্ষ করেও রচিত হতে পারে।

মনে হয় আধুনিক রম্যরচনার উদ্ভব ইংরেজি Belles Letters জাতীয় রচনা থেকেই। শব্দটি সম্ভবত সার জোনাথন সুইফ্‌ট ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম ব্যবহার করেন। সাধারণভাবে Belles Letters বলতে আমরা বুঝি কল্পনা-ঋদ্ধ এবং উপভোগ্য গদ্যভঙ্গিসহ যে-কোনো রচনা, জনসন যাকে আখ্যা দিয়েছেন 'Loose sally of mind.' বিষয়বস্তুর অমিত বৈচিত্র্য এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান রম্যরচনাকার রবার্ট লীন্ড যে মন্তব্য করেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে—এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় যা মন্তব্য করা হয়েছে তা স্মরণ করা যেতে পারে—'Modern usage applies the word more often to the little hills than to the mountain peaks of literature and denotes the essay and the critical study rather than the epics of Homer or the plays of Shakespeare.

অনেকে মনে করেন রম্যরচনার সঙ্গে ছোটগল্পেরও কিছু সাদৃশ্য আছে, কারণ রম্যরচনাতেও অনেক সময় একটি কাহিনীসূত্র থাকে যাকে অবলম্বন করে লেখক অগ্রসর হন।

।। সমালোচনা সাহিত্য ।।

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :

সবশেষে আসছি সমালোচনা সাহিত্য প্রসঙ্গে। একটি গল্প বা কবিতা, উপন্যাস বা নাটক একজন সাধারণ পাঠক পড়েন তার রস আস্বাদন করতে, তার আনন্দ উপভোগ করতে ; অবসর বিনোদন অথবা মনের খানিক খোরাক সংগ্রহ করাই তার অভিপ্রায়। তিনি বড়ো জোর তাঁর ভালো-লাগা বা না-লাগার কথা বলেন। অন্যদিকে একজন সমালোচক একটি শিল্পকর্মকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেন অনেক নিবিড়ভাবে। একটি রচনার ভাব ও বিষয়বস্তু, তার ভাষা, ভঙ্গি, রচয়িতার মানসদৃষ্টি ইত্যাদি নানা বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন তিনি। তাঁর ভালো-লাগা বা না-লাগাকে সম্যকভাবে ব্যক্ত করেন তিনি। শিল্প-সাহিত্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচারমূলক এক সম্যক মূল্যায়ন বা আলোচনাই **সমালোচনা (Criticism)** বলে গণ্য হয়ে থাকে। সাহিত্যরচনা ও পাঠ/উপভোগের পরেই শুরু হয় সাহিত্যবিচার তথা মূল্যায়নের। সেই প্রয়াসের ফলশ্রুতি সমালোচনা-সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রামায়ণী কথা'-র ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন যে '...যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারি পুরোহিত, তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তি-বিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।' তবে সমালোচকের সহৃদয় উদারতা থাকতে হবে একথা স্বীকার করেও বলা চলে যে, সমালোচনা অবশ্যই নিঃশর্তভাবে স্তুতিমূলক হবে এমন প্রস্তাব সর্বতোগ্রাহ্য নয়।

চলতি কথায় 'সমালোচনা' বলতে মনোভাবের বিরূপতা, এমনকি ছিদ্রান্বেষণও বোঝায়। সাহিত্যে 'সমালোচনা' কিন্তু এক সামগ্রিক, যুক্তিগ্রাহ্য, নিরপেক্ষ মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিমানসের প্রচ্ছায়ায় সমালোচনাকে এমনভাবে আবিষ্ট করা সঙ্গত নয় যে, মতপার্থক্য তিক্ততায় পর্যবসিত হবে। পক্ষপাতদুষ্ট আক্রোশ ও রসবোধের অভাবহেতু সমালোচনা একবগ্গা ও বৈরী হতে পারে ; আবার সমালোচকের নিজস্ব পছন্দের কারণে কোনো রচনা বা তার লেখক সম্পর্কে তিনি অযৌক্তিক উচ্ছ্বাস দেখাতে পারেন। এর কোনোটিই আদর্শ সমালোচনা বলে বিবেচিত হতে পারে না। সমালোচক তাঁর পাঠ ও পর্যালোচনায় স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি আশ্রয় করবেন সেটাই স্বাভাবিক, তবে নিছক তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ও ভালো মন্দ লাগার ভিত্তিতেই একটি সাহিত্যকর্মের মূল্য চূড়ান্তভাবে নিরূপিত হবে তা হতে পারে না। অর্থাৎ সমালোচকদের থাকতে হবে সহৃদয়তা, উদারতা এবং সর্বোপরি রসবোধ, যা না থাকলে শিল্প-সাহিত্যের আনন্দ ও সৌন্দর্যকে সম্যক অনুধাবন করা অসম্ভব। এ সব গুণের সমাহারে সমালোচক একটি শিল্পকর্মকে পাঠকদের কাছে বিশদভাবে মেলে ধরবেন। 'সমালোচনা' তাই সাহিত্যের একটি শ্রেণিবিভাগ রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। Richard Dutton-এর সংজ্ঞায় 'সমালোচনা' হলো

'the understanding and appreciation of literary texts.' আর সমালোচনায় সমালোচকই মুখ্য। সাহিত্যের মূল্যবিচার ও পাঠকবর্গের সঙ্গে মূল্য বিনিময়ে তিনিই মূল কর্তা। Abercrombie-র বয়ানে 'The criticism of literature is often as entirely individual as the creation of literature, and as much the work of undeniable genius.' সাহিত্য সৃষ্টির ভাব ও ভাষাগত তাৎপর্য, তার উদ্দেশ্য ও মূল্যের সম্যক বিচার পাঠকবর্গের গোচরীভূত করা সমালোচকের দায়িত্ব। Abercrombie-র ভাষায় সমালোচকের কাজ হল : 'discover the purpose, judge its worth, criticize the technique'. সাহিত্য-সমালোচক কীভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন সে-বিষয়ে সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমালোচনার কথা'-র এই পংক্তিগুলি স্মর্তব্য : "ব্যক্তিগত ভাল লাগার ভাবোচ্ছ্বাস বা ভাল না লাগার নিরুচ্ছ্বাস নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না ; তিনি যথাসম্ভব নিস্পৃহ, নিরাসক্ত ও বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য বিচারে এমনভাবে প্রবৃত্ত হবেন যাতে পাঠকের সঙ্গে সাহিত্যের প্রাথমিক পরিচয় ঘটতে কোন বাধা, কোন আরোপিত নিয়মকানুনের বাঁধন না পড়ে। সাহিত্যসমালোচনায় যথোচিত সিদ্ধির ব্রতে সমালোচকের দশটি গুণের উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়—"ভুয়োদর্শন, আত্মসমালোচনা, সতর্কতা ও পরমতসহিষ্ণুতা, লেখকের প্রতি সহানুভূতি, মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য, যৌক্তিকতার প্রতি নিষ্ঠা, নিস্পৃহতা, লেখকের চিত্তভূমিতে অধিষ্ঠিত হবার স্বাভাবিক সামর্থ্য।"

একজন আদর্শ সমালোচক তাঁর ব্যক্তিগত সংস্কার, পাণ্ডিত্যের অভিমান এবং অহমিকার দ্বারা পরিচালিত হন না। তিনি শিক্ষিত মন ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হন। এজন্য তাঁকে শিল্প-সাহিত্য জগতের মূল নীতিগুলি গভীরভাবে জানতে হয়, অবাধে বিচরণ করতে হয় গ্রন্থরাজ্যে, নিজেকে তৃপ্ত হতে হয় ও পাঠকসাধারণ্যে সঠিক রুচি তৈরি করতে হয়। সাহিত্যের তত্ত্ব ও নীতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় তিনি পাঠকের রসাস্বাদন ও উপলব্ধির সহায়ক হয়ে ওঠেন। নিরপেক্ষতা, সামগ্রিকতা ও ভারসাম্যের গুণে সার্থক 'সমালোচনা'য় সমালোচকেরও আত্মমুক্তি ঘটে।

সমালোচনা : মূল প্রবণতা, বিবিধ পদ্ধতি :

সাহিত্য-সমালোচনার মূল দুটি প্রবণতা। একটি রোমান্টিক, আর অন্যটি ক্ল্যাসিকাল। ব্যক্তিগত আবেগ যদি সমালোচনার পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করে তবে তাকে বলা যায় রোমান্টিক ; সমালোচকের অন্তরাত্মা এক্ষেত্রে কবি বা লেখকের সৃজনীপ্রতিভার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। অন্যপক্ষে যারা সাহিত্যের বিচারে নিয়ম-নীতি সঠিকভাবে মেনে চলার পক্ষপাতী তাদের সমালোচনা ক্ল্যাসিকাল। সাহিত্যকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তাঁরা মূল্যবিচারে প্রবৃত্ত হন। রবীন্দ্রনাথের *প্রাচীন সাহিত্য* যদি রোমান্টিক সমালোচনা-পদ্ধতির উদাহরণ বলে মনে করি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *মেঘদূত* তাহলে সনাতন-বিধিসম্মত আলোচনারূপে গণ্য হবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমালোচনা সাহিত্যের দিকে তাকালে যে-সব বিভিন্ন সমালোচনা পদ্ধতি নজরে পড়ে সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কাব্য-কবিতার সমালোচনায় একদল সমালোচক শব্দ, চিত্রকল্প, অলংকার ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ নির্ণয় করতে চান। এ-ধরনের পদ্ধতিকে বলা হয় **বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) পদ্ধতি**। যে সমালোচনা যুগচিত্ত, পরিবেশ-পরিপার্শ্ব ইত্যাদির নিরিখে সাহিত্যের বিচার করে থাকে তাকে

চিহ্নিত করা হয় ঐতিহাসিক (Historical) সমালোচনা পদ্ধতি রূপে। এছাড়া রয়েছে ব্যক্তিগত (Personal) ও মনোবিশ্লেষণী (Psychoanalytical) সমালোচনা পদ্ধতি। সমালোচক যদি কোনো সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নে তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা ও পছন্দকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন তবে তাকে ব্যক্তিগত সমালোচনা-রীতি বলে ধরা হবে। মনস্তাত্ত্বিক বা মনোবিশ্লেষণী পদ্ধতিতে সমালোচক লেখকের মন ও মানসিকতার প্রতিফলন খোঁজেন সাহিত্যকর্মে। তত্ত্বসন্ধানী (Philosophical) সমালোচনা পদ্ধতিতে একটি রচনার মধ্যে কোন্ সত্য নিহিত আছে অথবা তার সৌন্দর্য বা রসতত্ত্বের স্বরূপই বা কি তার সন্ধানে ব্রতী হন সমালোচক। তুলনামূলক (Comparative) সমালোচনা বলে আর এক পদ্ধতি রয়েছে যেখানে ভাব, বিষয়, শব্দ সম্পদের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা পারস্পরিক উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিরূপিত হয়। এছাড়া আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনায় নানা নতুন পদ্ধতি বা ভাবুকতা তথা দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তদনুযায়ী সমালোচক-গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করছেন। নাম করা যেতে পারে পরিসংখ্যানমূলক সমালোচনা পদ্ধতি (Statistical Method), ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচনা পদ্ধতি (Impressionist Criticism), ব্যবহারিক সমালোচনা পদ্ধতি (Practical Criticism), মার্কসবাদী সমালোচনা-পদ্ধতি (Marxist Criticism), বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পদ্ধতি (Objective Criticism), পাঠক-কেন্দ্রিক সমালোচনা পদ্ধতি (Reader-Response Criticism), উত্তর-আধুনিক (Post modernist), ও উত্তর-ঔপনিবেশিক (Post colonial) প্রতর্কের। তবে উত্তর-আধুনিকতা এবং উপনিবেশবাদ-উত্তর উপনিবেশবাদ-এর মতো অভিধাগুলিকে সুসংবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট দর্শন প্রণালী তথা সমালোচনা-পদ্ধতি বলে মনে করাটা সঠিক হবে না। বরং এগুলিকে আন্তর্বিষয়ক অ্যাকাডেমিক-ইনটেলেকচুয়াল প্রজেক্ট হিসেবে গণ্য করাটাই উচিত হবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচনার ধারা :

প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্যবেত্তা, অলংকারশাস্ত্রবিদ ও নন্দনতাত্ত্বিকেরা সাহিত্যবিচারে টীকা/ভাষ্য রচনা করেছেন; কাব্য, নাটক ইত্যাকার সৃজনীশিল্প বিষয়ে মূল্যায়নের মাপকাঠি নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। আধুনিককালে সাহিত্যের ভাষ্য বা টীকা রচনার বিষয়টি 'সমালোচনা' বা তার প্রতিশব্দ 'Criticism' দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে — এটি বর্তমানে অন্যতম সাহিত্য শাখা তথা Genre হিসেবে গণ্য হচ্ছে। Criticism-কে একালের ভাষ্যকার মার্টিন গ্রে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে — "the interpretation, analysis, classification, and ultimately judgement of works of literature, which has become a kind of literary genre itself."

মহাকবি কালিদাসের আমল থেকে 'চর্যাপদ' পর্যন্ত সাহিত্যের ভাষ্য হিসেবে টীকাকারদের রচনা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রাচ্য সমালোচনা সাহিত্যের বিচিত্র ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল কাব্যতত্ত্ব তথা অলংকারশাস্ত্র-বিষয়ক আলোচনায়। ব্যাকরণ, দর্শন, সৌন্দর্যতত্ত্ব ইত্যাদির নানা পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা স্থান পেয়েছিল সে-সব আলোচনায়। *নাট্যশাস্ত্র*-র প্রণেতা আচার্য ভরত ছিলেন রস-প্রস্থানের পুরোধা, *কাব্যালংকার*-এর রচয়িতা আচার্য ভামহ ছিলেন অলংকার-প্রস্থানের প্রবর্তক। আচার্য বামন ও আচার্য দণ্ডী রীতি/অবয়ব সংস্থানের বিশিষ্টতাকেই কাব্যাদর্শরূপে তুলে ধরেছিলেন। *ধ্বন্যালোক*-খ্যাত আনন্দবর্ধন ও 'লোচন'-এর রচয়িতা অভিনবগুপ্ত 'ধ্বনি'-কেই বলেছিলেন কাব্যের আত্মা। এরও পরে বক্রোক্তি-প্রস্থানের প্রবর্তক আচার্য কুন্তক শব্দ ও অর্থের 'পরস্পরস্পর্ধা'-কে চিহ্নিত করেছিলেন কাব্যের প্রাণরূপে।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রচিত গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর *রিপাবলিক* গ্রন্থটিকেই পাশ্চাত্য সমালোচনা-সাহিত্যের আদি গ্রন্থ বলে মনে করা হয়। মিথ্যাচারী ও ঐশী উন্মাদনাগ্রস্ত বলে প্লেটো কবিদের নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র থেকে। 'অনুকৃতি' বা Mimesis-এর তত্ত্ব দিয়ে প্লেটো কবির সৃজনকে বলেছিলেন অসার প্রপঞ্চের নকলমাত্র এবং সে-কারণে পারমার্থিক সত্য থেকে দূরবর্তী। এছাড়া কবির কল্পনা মানবচিত্তের কোমলতা জাগ্রত করে ও তার শৌর্য-বীর্যের হানি ঘটায়। সুতরাং তা বর্জনীয়।

প্লেটোর শিষ্য, *পোয়েটিক্‌স্* নামক অতি-মূল্যবান তত্ত্ব-গ্রন্থের প্রণেতা, দার্শনিক অ্যারিস্টটল অনুকৃতি-ভাবনায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে প্লেটোর ভাববাদী প্রস্থানকে খণ্ডন করলেন। কাব্য বাস্তব জীবনের যান্ত্রিক প্রতিচ্ছবি নয়, বরং এক তাৎপর্যমণ্ডিত সৃজনী পুনর্নির্মাণ, যা এক অন্যতর, উচ্চতর সত্যের অভিমুখী — এভাবেই অ্যারিস্টটল Mimesis-এর তত্ত্বকে দিলেন সর্বজনীন যুক্তিগ্রাহ্যতা। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যতত্ত্বের দুই পথপ্রদর্শক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল উত্তরকালের পাশ্চাত্য সমালোচনার ধারায় সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বরূপে স্বীকৃত।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের যাত্রারম্ভ উনিশ শতকের নবজাগরণের বাতাবরণে। 'তত্ত্ববোধিনী', 'সংবাদ প্রভাকর' ইত্যাদি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ সেই জয়যাত্রার কাণ্ডারী ছিলেন। প্রকৃত আধুনিক সমালোচনার সূত্রপাত রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায়। বিদ্যাসাগরের *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৩) এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ* (১৮৫৪) বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের প্রথম দুটি যথার্থ দৃষ্টান্ত। এরপর 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত', 'গীতিকাব্য', 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদেমোনা' ইত্যাদি প্রবন্ধে সাহিত্যবিচারের মানদণ্ডটি স্থির করে দেন। বঙ্কিম-সমকালীন সমালোচকদের মধ্যে ছিলেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, পূর্ণচন্দ্র বসু প্রমুখ।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ শিল্পবোধ, সৌন্দর্য-উপলব্ধি, রসবোধ ও অধ্যয়নজাত পরিশীলিত মননে সমালোচনাকে দিয়েছেন এক স্বতন্ত্র মাত্রা। *সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ* গ্রন্থগুলিতে সমালোচনার মূল নীতি ও আদর্শগুলি আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্র-পরবর্তীদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ পাশ্চাত্য সমালোচনা তত্ত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত। কবি-সমালোচকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিবাদী রোমান্টিক পদ্ধতি, সুধীন্দ্রনাথের মননধর্মী, দার্শনিকতাস্পৃষ্ট বিচার, বিষ্ণু দে-র মার্কসীয় বৌদ্ধিক পঠন-পাঠন ; এবং এতদ্ব্যতীত আবু সয়ীদ আইয়ুবের রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য চর্চা, প্রমথনাথ বিশীর রসজারিত বিশ্লেষণাত্মক রচনা এবং সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অলংকারতত্ত্বনির্ভর বিচার-পদ্ধতি উল্লেখের দাবি রাখে।

যে সাবজেক্টিভ সমালোচনা, তা এই বিচারে [illegible]

(৩) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) : যুগচিত্ত, পারিপার্শ্বিক ও রচয়িতার ব্যক্তি-মানস কীভাবে ও কতখানি মূর্ত হয়ে উঠেছে কোনো একটি সাহিত্যকর্মে, ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে তারই বিচার করা হয়। পাশ্চাত্যে এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন হিপোলাইত তেইন (Taine) ; মার্কিন সঙ্কলকদ্বয় হ্যাণ্ডি ও ওয়েস্টব্রুক-এর *Twentieth Century Criticism* (1974)-এ 'Historical Criticism' অংশে তেইন ছাড়া অন্যান্য সমালোচকদের মধ্যে ছিলেন ট্রিলিং, এডমণ্ড উইলসন, পীয়ার্স, এলম্যান প্রমুখ। তেইন-এর আগে ভিকো-র *ইলিয়াড-ওডিসি* মহাকাব্য দুটির আলোচনায় কিংবা হেগেলের 'Philosophy of History' শীর্ষক বক্তৃতায় সাহিত্য ও নিত্য পরিবর্তনশীল দেশ-কাল-সমাজের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা ছিল। তেইন-এর সমকালীনদের মধ্যে সঁৎ-ব্যুভ (Sainte-Beuve) মূলত ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষিতে সাহিত্যিকের ব্যক্তিমানসের বৈচিত্র্য সন্ধানের কথা বলেছিলেন।

তেইন সাহিত্যকারের ব্যক্তিসত্তার চাইতে যে-সকল সামাজিক শক্তির মধ্যে থেকে সাহিত্যের জন্ম হয় সেগুলিকেই বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যভাবনার মধ্যে ঐতিহাসিক মূল্যায়নের সূত্রটি বিধৃত —"... a literary work is not a mere individual play of imagination, the isolated caprices of an excited brain, but a transcript of contemporary manners, a manifestation of a certain kind of mind... We might discover, from the monuments of literature, a knowledge of the manner in which men thought and felt centuries ago." এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সাহিত্য বিচারে তিনটি অনুধাবনীয় সূত্র দিয়েছিলেন তেইন—'Race', 'Milieu' ও 'Moment'। অধুনা আমরা 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' (Sociology of Literature) বিষয়ক যে আলোচনার সাক্ষাৎ পাই তেইন তার জনক। কোনো সাহিত্যিক ও তাঁর সাহিত্যকর্ম পাঠ ও বিচারে আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্রষ্টা যে-দেশে ও যে-কালে, যে সামাজিক পরিবেশে সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন তার পরোক্ষ ভূমিকাই তাঁকে স্রষ্টারূপে গঠন করেছে। ইতিহাস একটি সজীব প্রবাহ, অতীতের ঘটনাবলীর বিবরণ মাত্র নয়, এবং সাহিত্য তার বর্তমানের মধ্যে অতীতকে তুলে

ধরে সজীব বস্তুরূপেই, এমন অভিমত আমরা পেয়েছিলাম হার্ভে পীয়ার্স-এর 'Historicism Once More' প্রবন্ধে।

বাংলা ভাষার সমালোচনা সাহিত্যে বঙ্কিম ইতিহাস তথা কালচেতনার দ্বারা কিছু প্রভাবিত হলেও তিনি তেইন-প্রবর্তিত ঐতিহাসিক পদ্ধতি দ্বারা চালিত হন নি। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর সৃজনী, সৌন্দর্য-অভিলাষী মন ; ঐতিহাসিক পদ্ধতির বস্তুবাদী দর্শন তাঁর ভাবনার সহমর্মী নয়। একালের সমালোচনাকর্মের মধ্যে বিনয় ঘোষের নূতন সাহিত্য সমালোচনা, অরবিন্দ পোদ্দারের বঙ্কিম মানস, সীতাংশু মৈত্রের যুগন্ধর মধুসূদন, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত তারাশঙ্কর : দেশ, কাল ইত্যাদির নাম করা যায়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'মহাকাব্যের লক্ষণ' ঐতিহাসিক পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। মহাকাব্য একটি বিশেষ কাললক্ষণকে স্বীকার করে নিয়ে সার্থকতা অর্জন করেছে এবং সেই কারণে আমাদের কালে আর মহাকাব্য রচনা সম্ভব নয়, রামেন্দ্রসুন্দরের এহেন অভিমত থেকে যুগ-মানসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে লেখকের ধারণার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একালের প্রাবন্ধিক-সমালোচকদের মধ্যে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁর তারাশঙ্কর : দেশ, কাল প্রবন্ধে দেশ ও কালের বিভিন্ন ঘটনার ইতিবৃত্তের প্রেক্ষিতে তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসের আলোচনা করে দেখিয়েছেন সমকালীন ইতিহাসের পদধ্বনি কীভাবে তারাশঙ্করের রচনায় ছাপ ফেলেছে : "সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিভূ হয়েও তারাশঙ্কর দেশসেবার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রায় ষাট বছরের ইতিহাসকে তাঁর গল্প-উপন্যাসে ধরে রেখেছেন সেই চৈতালী ঘূর্ণী, পাষাণপুরীর আমল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত।" সমকালকে কীভাবে তারাশঙ্কর সর্বকালের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, বস্তুনিষ্ঠভাবে তার পর্যালোচনা করেছেন সমালোচক এবং অসঙ্কোচে মন্তব্য করেছেন 'দেশ-কালের পরিবর্তন তাঁকে যতখানি উত্তেজিত করেছে ততখানি শৈল্পিক নিরাসক্তি দেয় নি।'

(৭) ঐতিহাসিক নাটক

ইতিহাস নাটক নয়। কিন্তু ইতিহাস অবলম্বনে রচিত নাটকে ইতিহাসের তথ্যকে অবিকৃত রেখে নাট্যকার তাতে নতুন ভাবসত্যের আরোপ করেন বা করে থাকেন। কেননা, নাটক জীবনের বাঙ্ময় রূপায়ণ। ইতিহাসের নীরস তথ্যকে নাট্যকার জীবনের রসরূপে মণ্ডিত করে দৃশ্য ও শ্রব্যরূপে উপস্থাপিত করেন। "নাট্যকার ইতিহাসকার নন। তাঁর কাজ, ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে, ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে জীবনের যে স্বরূপ নিহিত আছে, সেই রূপকেই ফুটিয়ে তোলা। সমাজজীবনের বা ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস দ্বারা নাট্যকারের কল্পনা নিয়ন্ত্রিত একথা সত্য, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত পরিধির মধ্যে কল্পনার স্বাধীন সাধনার অধিকার তাঁর অবশ্যই আছে। ইতিহাস নাট্যকারকে আবলম্বন বিভাব (পাত্র-পাত্রী) ও উদ্দীপন বিভাব (দেশকাল পরিস্থিতি) যোগালেও নাট্যকার নাটকের আসলটুকু অর্থাৎ অনুভাবাদি নিজেই সৃষ্টি করে থাকেন। আর সেই সৃষ্টির মহিমাতেই নাট্যকারের কবিকীর্তি।" (ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য)।

বাংলা ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের অনবদ্য ভূমিকা বিষয়ে সাহিত্যানুরাগীমাত্রই একমত যে, ইতোপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক নাটক রচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও দ্বিজেন্দ্রলালের হাতেই তার সিদ্ধি ও ঋদ্ধিলাভ ঘটেছিল।

বস্তুতঃ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের রচিত তাঁর নাটকগুলি তথ্যের প্রাচুর্যে, চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, সংলাপের অবিস্মরণীয় কারুকার্যে, মনন ও জীবনবোধের গভীরতায়, জাতীয় চেতনার উন্মাদনায়, সংগীতের নুপুর নিক্কনে, পরিবেশ সচেতনায় অসাধারণ মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠল। দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার যথার্থই লিখেছেন—"তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি যথেষ্ট বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত লিখিত। কোনো স্থানেই তিনি ইতিহাসকে অযথা বা সর্বথা অতিক্রম করিয়া যান নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, মাত্র সেখানেই তাঁহার মোহিনী কল্পনা সুদক্ষ স্বাধীনতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে। নাটক ইতিহাস নহে; কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক যে একেবারে ইতিহাস ছাড়াও নহে,—তিনি তৎসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না।" (দেবকুমার রায়চৌধুরী)

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাই'। এরপর তিনি প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবার পতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল বিজয়—এই ক-টি নাটক লেখেন ইতিহাস অবলম্বনে। 'মেবার পতন' নাটকে ইতিহাসের মর্যাদা কতখানি রক্ষিত হয়েছে, সে বিষয়ে পণ্ডিত মহলে নানা মত রয়েছে। আমাদের বিচার্য বিষয়ও এটাই।

মেবার-পতন নাটকের উপাদান দ্বিজেন্দ্রলাল টডের 'রাজস্থান' গ্রন্থ থেকে নিয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ও সিংহল বিজয় ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য ঐতিহাসিক নাটকগুলির উৎসও তাই। প্রতাপ সিংহ নাটকে রাণা প্রতাপের সঙ্গে মোগল সম্রাটের দীর্ঘকালের সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও বীরত্বের অসামান্য কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মেবার-পতন নাটকে তাঁর পুত্র অমরসিংহের আমলে মোগল বাহিনির সঙ্গে বারবার সংগ্রাম ও মেবারের পতনের দুঃখজনক কাহিনির নাট্যিক বিন্যাস। কিন্তু এই নাট্যকার সেই সঙ্গে এক 'মহানীতি'-র আদর্শ তুলে ধরেছেন—সে নীতি বিশ্বপ্রেম। তবে ইতিহাস অবলম্বনে নাটক রচনা করতে বসে ইতিহাসের যাথার্থ এবং ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল তিনি কতটা রক্ষা করতে পেরেছেন—সেটাই বর্তমান আলোচ্য বিষয়।

রাণা প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অমরসিংহ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'রাজস্থানে' উক্ত হয়েছে যে, রাণা প্রতাপ মৃত্যুর পূর্বে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে, তাঁর পুত্র অমরসিংহ বিলাসিতায় ডুবে গিয়ে মেবারের স্বাধীনতার কথা ভুলে যাবে; যে দীন কুটিরে রাণা আজ মৃত্যুর সম্মুখীন, সেখানে সুরম্য প্রাসাদ গড়ে উঠবে—"These sheds", said the dying Prince, "will give way to sumptuous dwellings, thus generating the love of ease, and luxury with its concomitants will ensure, to which independence of Mewar, which we have to bled to maintain, will be sacrificed, and you, my chiefs, will follow the pernicious example." কিন্তু সামন্তগণ প্রতাপের সামনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, মেবারের পূর্ণ স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পর্ণ কুটীরেই বাস করবেন, বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেবেন না, এবং তাঁরা জীবিত থাকতে রাণা প্রতাপের আদর্শ যাতে অমর সিংহ মেনে চলেন, সে বিষয়ে তাঁরা লক্ষ্য রাখবেন।

১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে অমরসিংহ সিংহাসনে বসেন। শৈশব থেকেই—'he had been his constant companion and the Partner of his toils and dangers.' কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের পর অমরসিংহ রাজ্য শাসনের সুব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসের

স্রোতে গা ভাসালেন "Amra remodelled the institutions of his country made a new assessment of the lands and distribution of the fief apportioning the service to the times. He also established the gradation of ranks... and regulated the sumptuary laws.....

The repose thus enjoyed realised the prophetic fears of Pratap whose admonitions were forgotten. Amra constructed a small palace on the banks of the lake, named after himself 'the abode of immortality' (Amara Mahall)....

জাহাঙ্গীর মেবার আক্রমণে সৈন্য পাঠালে অমরসিংহ প্রতিরোধের জন্য উদ্যোগী হয়ে সন্ধির জন্য ব্যগ্র হলেন। বীর চন্দাবৎ রাণাকে তাঁর পিতা প্রতাপসিংহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও রাণা তাতে কর্ণপাত করলেন না। শালুমব্রাধিপতি রাণার বিলাসিতার প্রতীক মূল্যবান আয়না চূর্ণ করেছিলেন। সামন্তদের চাপেই রাণা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং মোগল সৈন্য পরাজিত হয় ("the royal army led by the brother of Khanakhanan— entirely defeated.') (১।৮)। কিন্তু এই যুদ্ধে মেবারের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল—('with the loss of the bravest of the chiefs Mewar.' এর পর জাহাঙ্গীর সগরসিংহকে চিতোরের রাণা পদে নিযুক্ত করেন রাণা অমরসিংহের বাহিনীতে ভাঙন ধরানোর জন্য (২।২)— hoping to withdraw from the standard of Amra many of his adherents.' কিন্তু সগরসিংহ খুব অস্বস্তিতে কাল কাটান— মেবারবাসী কারও আনুগত্য তিনি পাননি (২।৪)। অবশেষে ভ্রাতুষ্পুত্র অমরসিংহের হাতে চিতোর দুর্গ অর্পণ করেন (২।৪)। শেষপর্যন্ত সগরসিংহ অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সামনে আত্মহত্যা করেন (৩।৫)—"Sometime after, upon going to court, and being upbraided by Jahangir, he drew his dagger and slew himself in the emperor's presence : an end worthy of such a traitor." জাহাঙ্গীরের আমলে চিতোর আক্রমণে সেনাপতি ছিলেন আবদুল্লা। কিন্তু তার সৈন্যবাহিনী মোগলবাহিনী পর্যুদস্ত হয় ('The imperial army, under its leader Abdulla was almost exterminated'(২।৩)। এরপর পরভেজের নেতৃত্বে মোগলসৈন্য মেবার আক্রমণ করে পরাজিত হয়। ("The imperial army was disgracefully beaten and fled, pursued with great havoc, towards Ajmer. The Mu historian admists it to have been a glorious day for Mewar.") এরপর ক্ষিপ্ত সম্রাট জাহাঙ্গীর পরভেজের পুত্রকে সেনাপতি করে, তাঁর সঙ্গে মহাবীর মহাবৎ খাঁকে নিয়ে মেবার আক্রমণ করতে পাঠালেন (৩।৪, ৪।৩) ("This son, tutored by the great Mahabat Khan, fared no better than Parvez : he was routed and slain.") বারবার এই বিপর্যয়ে ক্ষুব্ধ সম্রাট এবার পুত্র খুরম (সাজাহান)-কে পাঠান কিন্তু এবারের যুদ্ধে রাণা পরাজিত ও সন্ধি করতে বাধ্য হলেন।

টডের রাজস্থানে আছে আগে আবদুল্লা, পরে মহাবৎ খাঁ মেবার যুদ্ধে এসেছিল কিন্তু প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থে আছে, "Mahavat Khan, when first on that service had gained a victory over the Rana, but was unable to do anything

decisive from the strength of the country into which he, as usual, retreated. The same fortune attended Abdullah Khan afterwards appointed to succeed Mohavat...।" এরপর যুবরাজ খুরম বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মেবার আক্রমণ করেন এবং পরাজিত রাণা সন্ধি করতে বাধ্য হন—"...The Rana was at last induced to sue for peace, and his offer being readily accepted, he waited on Shahjahan in person, made offerings in token of submission, and sent his son to accompany the prince to Delhi." (মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন)। 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া'তে আছে যে, জাহাঙ্গীর সম্রাট হয়ে মেবার আক্রমণে তাঁর পুত্র পরভেজকে বিরাট বাহিনিসহ পাঠান। এবারই সগরসিংহকে চিতোরের রাণাপদে নিযুক্ত করা হয় অন্তঃকলহ বাধানোর উদ্দেশ্যে। অমরসিংহ সিংহাসনে বসে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার করেন, কিন্তু কিছুটা পরিমাণে সামরিক শক্তির প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন ('Devoted himself to internal reforms, but had to some extent lost the martial vigour.')। সামন্তদের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েই রাণা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মহাবৎ খাঁ প্রথমে। তারপরে আবদুল্লা মেবার আক্রমণ করেন। কিন্তু কেউই সফল হন না। এরপর খুরম মেবার আক্রমণ করেন। রাণা পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন।—রাণা—'Sent overtures to Khurram offering to recognise Mughal supermacy, but begging that he might be excused at court owing to his age."

টডের অনুসরণে মেবার-পতন নাটকে মহাবৎ ও আবদুল্লার মেবার আক্রমণের ক্রম নিয়ে ইতিহাসের ব্যত্যয় থাকলেও ঘটনা যে যথার্থ, তা ইতিহাস সম্মত। মেবার যুদ্ধে মহাবৎ প্রথম দিকে কিছুটা সাফল্য পেয়েছিলেন, এটাও ঐতিহাসিক ঘটনা। নাট্যকার তাকেই মহাবতের ঘটনায় দেখিয়েছেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করলেও দুর্গে প্রবেশে তিনি অনিচ্ছুক। শেষ পর্যন্ত দুর্গে প্রবেশ অর্থাৎ মেবারকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও করায়ত্ত করলেন সাজাহান। এটা নাটকে দেখানো হয়েছে। তবে সম্রাটের সামনে সগরসিংহের আত্মহত্যা এবং মহাবৎ খাঁ সগরসিংহের পুত্র—এ দুটি ঘটনা অনৈতিহাসিক।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নাটক নিছক ইতিহাস নয়, তা জীবনেরও কথা। নাট্যকার ইতিহাসের ঘটনাকে নিয়ে তার সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে শাশ্বত জীবন-জিজ্ঞাসার বাণীবহ করে তুলতে চান। বিশেষ করে যে যুগে এ নাটক রচিত হয়েছিল, সে যুগটি ছিল জাতীয় জাগরণের উন্মাদনা ও আবেগসম্ভূত স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। সেই সুরটি এখানে উদাহৃত হয়েছে। অধিকন্তু নাট্যকার সেই উন্মাদনাকে ছাড়িয়ে তাঁর 'মহানীতি'—বিশ্বপ্রেমের আদর্শের স্তরে মানুষকে নিয়ে যেতে চাইছেন। তাই স্বভাবতই এক রোমান্টিক ভাবাদর্শের স্বর্গ নির্মাণে তিনি ইতিহাসের পরিমণ্ডলকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। নাট্যকার কল্পিত তিনটি চরিত্র—কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী যথাক্রমে দাম্পত্য, জাতীয় ও বিশ্বপ্রেমের প্রতীক। এঁরা কেউ ঐতিহাসিক চরিত্র নন। নাট্যকার তাঁর "উদ্দেশ্যমূলক নাটক" মেবার-পতনে "বিশ্বপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গরিয়সী"—এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের বাস্তবরূপটি তিনি একেবারে ক্ষুণ্ণ করেছেন, এমন অভিযোগ বোধ হয় সর্বাংশে সত্য নয়। অমর সিংহের সঙ্গে মহাবতের—ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, কিংবা সগরসিংহের সঙ্গে মহাবতের—আত্মীয়ের সঙ্গে

আত্মীয়ের যুদ্ধকে প্রতীকি হিসাবে ধরা যায়। মোগল সম্রাটের সঙ্গে রাজপুতের সৌহার্দ্য, এবং সেই সূত্রে মেবারের বিরুদ্ধে অন্য রাজপুতের যুদ্ধকে ভ্রাতৃঘাতী বা আত্মীয়ঘাতী যুদ্ধই বলতে হবে। শেষ পর্যন্ত যে অমরসিংহ ও মহাবৎ আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন, সেখানে অবশ্য নাট্যকারের আদর্শবোধ কাজ করেছে। সবদিক বিচার করে 'মেবার-পতন' নাটকটিকে নিখুঁত ঐতিহাসিক নাটক না বলতে পারলেও ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক ভাবাদর্শমূলক নাটক বলতেই হয়।

(৮) উদ্দেশ্যমূলক নাটক

দ্বিজেন্দ্রলাল কীর্তিমান নাট্যকার। তাঁর ইতিহাস অবলম্বনে রচিত নাটকগুলির মধ্যে একদিকে যুগজীবনের স্পন্দন, অন্যদিকে শাশ্বত মানবজীবনের দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ হৃদয়বেদনা, মানব-মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ ঘাত-প্রতিঘাত আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে দৃশ্যায়িত হয়েছে। মানুষের প্রতি অপরিমেয় বিশ্বাস ও ভালোবাসার সুর তাঁর নাটকের ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। বিশ শতকের প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, তাতে স্বদেশ ও স্বজনের মধ্যে পরাধীনতার জ্বালা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে তুলবার জন্য নাটক এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করল। প্রতাপাদিত্য, রাণা প্রতাপ, সিরাজদৌল্লা, মীরকাশিম, নন্দকুমার প্রমুখ ব্যক্তিত্ব জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার অগ্রণী নায়ক হিসাবে পরিগণিত হলেন। ইতোপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকে যে উদ্দীপনার ধারা সঞ্চার করেছিলেন, তাঁর পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল অতীত ইতিহাসের স্বর্ণ-রঙ্গিন প্রেক্ষাপটে গৌরবোদ্দীপক জাতীয় ঐতিহ্যের চিত্রপট মানুষের সামনে তুলে ধরতে লাগলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং তাকে কেন্দ্র করে জাতীয় উদ্মাদনা ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে মুক্তিসংগীতের মূর্তি পেল। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস, মেবার-পতন প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার মর্মবেদনা এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনাকে সংলাপ, চরিত্র ও গানে মূর্ত করে তুললেন। কিন্তু জাতীয় উদ্দীপনার স্তরেই দ্বিজেন্দ্রলাল থেমে থাকলেন না। 'মেবার-পতন' নাটকে এসে তিনি মানুষ হওয়ার সাধনারই যে প্রয়োজন, এই বাণীকে মূর্ত করে তুললেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের কথাতেই এই মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে—"আমি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ যেন দেখতে পাচ্ছি.....আমরা আবার জাগব, উঠব, মানুষ হব।...আমি বেশ চিনি না, বিদ্বেষ মানি না; আমি চাই শুধু বীর্যবল—ব্রহ্মচর্য; চাই শুধু সত্যনিষ্ঠা; চাই শুধু আসন, খাঁটি, ধ্রুব ও নিটোল ধর্মবল, আর ওই এক কথায় মনুষ্যত্ব।" 'মেবার পতন' নাটকে নাট্যকার জাতীয়ত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্বকে বড়ো করে দেখেছেন। তাঁর এ সময়ের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে নাট্যকার-পুত্র দিলীপকুমার রায় লিখেছেন—"It was then the heyday of Bengali Patriotism and he caught its contagion..... But in the first flash of our patriotic adolescence we had all devoutly believed in the gospel of nationalism (which came, ever since, to suck mankind down into real hell with the pledge of a phantom heaven) and had burned with hatred of everything foreign....

It was at this point that Dwijendralal grew suddenly and utterly sick of patriotism. It was at this turning point of his life that he wrote

'Fall of Mewar'. And it was only then that we, his deep admirers, discovered that Patriotism was a false guide."

'মেবার-পতন' নাটকে নাট্যকার জাতীয়তা দেশাত্মবোধ অপেক্ষা যথার্থ মনুষ্যত্বের সাধনায় ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একেই তিনি বলেছেন মহানীতি। আর এই মহানীতির আদর্শ মূর্ত করে তুলবার জন্য তিনি যে কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানে প্রথমেই দেখা যায় জাতীয়তার গরিমা-শিখা; ক্রমে তাকে অতিক্রম করে মানুষ হওয়ার আদর্শ প্রতিষ্ঠা। ভূমিকা অংশেই নাট্যকার এ সম্পর্কে বলেছেন—

"কিন্তু এই নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম, এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরিয়সী..... অতএব এই আমার প্রথম উদ্দেশ্যমূলক নাটক।"

'মেবার-পতন' নাটকটিতে যে কাহিনি বিবৃত হয়েছে, তা হল—রাণা অমরসিংহের সঙ্গে মোগলবাহিনীর বারবার যুদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত রাণার পরাজয় স্বীকার ও সন্ধি স্থাপন। কিন্তু এটা নাটকের বহিরঙ্গ খোলসমাত্র। এর অন্তরালে নাট্যকার বিশ্বপ্রেমের আদর্শকে ধাপে ধাপে অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে উপসংহারে নিয়ে গিয়ে তাকে জয়যুক্ত করেছেন। সুতরাং, মেবারের পতন হলেও নাট্যকারের আদর্শের জয় ঘোষিত হয়েছে। নাটকের সূত্রপাত দেশাত্মবোধে, সমাপ্তি ঘটেছে বিশ্বপ্রেমের জয় ঘোষণায়।

শুরুতেই দেখা যায়, মোগল-বাহিনী-মেবার আক্রমণ করেছে; রাণা মোগলের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছুক; কিন্তু সেনাপতি গোবিন্দ সিংহ তাতে বিমর্ষ। দীর্ঘ বছর ধরে তিনি রাণা প্রতাপের সঙ্গে থেকে অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন। আজ রাণার সন্ধি প্রস্তাবে তিনি সায় দিতে পারেন না। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে তাই সামন্তদের, এবং সর্বোপরি সত্যবতীর ভাষণে উদ্দীপ্ত রাণা সন্ধি অপেক্ষা যুদ্ধের পথ বেছে নেন। হেদায়েৎ, আবদুল্লা একে একে পরাজিত হয়। বস্তুতঃ সত্যবতীই চারণী বেশে রাজ্যের বীর-চেতনাকে উদ্দীপিত করতে প্রধান ভূমিকা নেন। রাণা যখন মহাবতের সঙ্গে যুদ্ধে অনিচ্ছুক হন সৈন্যবলের অভাবে, তখনও সত্যবতী রাণাকে জাগ্রত করেন। শেষ পর্যন্ত মেবারের পতনে তাঁর উদ্যত অস্ত্র চারণীদলের গানের মধ্য দিয়ে ঝড়ে পড়ে—"ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।" কিন্তু মানসী তাঁকে নতুন বোধে জাগিয়ে তোলেন—"যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়, মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হ'য়ে যাক্! দেশ স্বাধীনতা ডুবে যাক—এ জাতি আবার মানুষ হোক।"

কল্যাণী স্বামীপ্রেমে মগ্ন ছিল। অপরিমেয় পতিভক্তির কারণে সে দেশ, জাতি ধর্ম, স্বজন—সব কিছুই উপেক্ষা করেছিল। পতিভক্তির আদর্শের এও চরম রূপ। নাটকের শুরুতেই দেখি, পিতা গোবিন্দ সিংহের তরবারি বিধর্মীর রক্তপান করতে চায় শুনে সে ভয়ে শিউরে উঠে। তার স্বগোক্তি—'যদি জান্তে বাবা! যদি বুঝতে!'—এর মধ্য দিয়ে তার হৃদয়ের ভাষাটুকুও আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। স্বদেশ ও স্বজন প্রেম অপেক্ষা তার কাছে পতিপ্রেম অনেক বড়ো। আর সে কারণে পিতৃপরিত্যক্তা কল্যাণী বিধর্মী, বিরুদ্ধপক্ষের সেনাপতি, স্বামী মহাবতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কূল ছেড়ে অকূলের পথে পাড়ি দেয়। কিন্তু তারও

স্বপ্ন ভেঙে যায়। দর্পী মহাবতের যে ভয়ংকর মূর্তি তার সামনে প্রতিভাত হয়, তাকে স্বামী বলে সে গ্রহণ করতে পারবে না। স্বামীকে পেতে গিয়ে সে ভাইকে হারিয়েছে, এখন স্বামীকেও হারালো। একই সঙ্গে স্বামী-ভাই—দুইই সে হারালো। শেষ পর্যন্ত অকূলে ভেসে বেড়ানো কল্যাণী মানসীর কাছে শিক্ষা পেল—"তুমি তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর। সান্ত্বনা পাবে। বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় না; যোগ্য অযোগ্য বিচার করে না। সে সেবা ক'রে সুখী।"

আর মানসীর মধ্যে এই বিশ্বপ্রেমের আদর্শ অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে বিশাল মহীরুহরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। অজয়কে সে ভালোবাসে। কিন্তু সেই ব্যক্তিপ্রেম ছাপিয়ে বিশ্বপ্রেম ক্রমে মহাসাগরের কল্লোলে পরিণত হয়েছে। প্রথম দিকে তার হৃদয়ে ছিল ব্যক্তিক প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মেশামেশি। অজয়কে সে ভালোবাসে আবার সেই সঙ্গে মানুষ মাত্রকেই সে ভালোবাসে। সেই মনুষ্যপ্রেমের আকর্ষণেই সে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সেবার জন্য যায়, বিবাহ নামক ক্ষুদ্র সুখের গণ্ডিতে সে বাঁধা পড়তে চায় না। অজয় মানসীর এই স্বরূপ উপলব্ধি করে মানসীর কাছে, প্রেম নয়, করুণা ভিক্ষা করে, আর আত্মার হরিদ্বারে তীর্থস্নান করার জন্য ভগ্নী কল্যাণীকে উপদেশ দেয়, এবং শেষপর্যন্ত মানসীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরহিতার্থে জীবন বলি দেয়। অজয়ের মৃত্যু মানসীর জীবনে একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের মতো। মানসীর অন্তরে অজয়ের জন্য যে প্রেম এতদিন সংগুপ্ত ছিল, অজয়ের মৃত্যুরূপ দমকা বাতাসে সে আবরণ ঘুচে যায়, প্রিয় শিষ্য সেই মুহূর্তে গুরুর আসন অধিকার করে। কিন্তু ঝড় থেমে যায়। মানসী বিশ্বপ্রেমের মূল সুর আবার নিজের মধ্যে ফিরে পায়—"আবার সেই মৃদুগম্ভীর অনাদি সংগীত শুনতে পাচ্ছি—শতগুণ মধুর। মেঘ কেটে গিয়েছে। আবার আকাশের সেই নক্ষত্রোজ্জ্বল অবারিত নীলিমা দেখতে পাচ্ছি—শতগুণ নির্মল। আমার কর্তব্যপথ আজ জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের সীমা ছাড়িয়ে, বহুদূরে প্রসারিত দেখছি।" মানসীর মনে এখন আর ব্যক্তিপ্রেমের পিছুটান নেই। তাই অনিবার গতিতে সে বিশ্বপ্রেমের মহাসমুদ্রের দিকে ধাবিত হল। দাম্পত্যপ্রেমের প্রতীক কল্যাণী এবং দেশপ্রেমের প্রতীক সত্যবতীকেও সে তার আদর্শে ব্রতী করে নিল। এরপর মহাবৎ ও অমরসিংহের ভ্রাতৃঘাতী কলহ সে দূর করল, এই বিশ্বপ্রেমের আদর্শ দিয়ে। মানুষ হওয়ার এই সাধনা কীরূপে সম্ভব, তার উত্তরে মানসী শিখিয়েছে—'শত্রুমিত্রজ্ঞান ভুলে গিয়ে বিদ্বেষ বর্জন করে।' নিজের কালিমা, দেশের কালিমা, বিশ্বপ্রেমে ধৌত করে দিয়ে। সুতরাং নাটকের উপসংহারে জয়যুক্ত হয়েছে বিশ্বপ্রেমাদর্শের। স্বজন, দেশ ডুবে যাক, আত্মপর ভুলে গিয়ে—'বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভাইয়ের টান।' মনুষ্যত্বের সাধনাই হোক জীবনের একমাত্র ব্রত—'আবার তোরা মানুষ হ।'

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল একটি বিশেষ আদর্শে প্রতিষ্ঠা করে এই নাটক রচনা করেছেন। সুতরাং, 'মেবার-পতন' যথার্থ একখানি উদ্দেশ্যমূলক নাটক।